শিরোনাম

নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ : সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে

পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক: শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস

তত্ত্বাবধায়ক: অধ্যাপিকা গোপা দত্ত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

২০২১

Certified that the Thesis entitled

নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ : সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Prof Gopa Dutta And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: Candidate:

Dated: Dated:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা গোপা দত্ত ভৌমিককে। তাঁর অশেষ সাহায্য ও মূল্যবান পরামর্শ ছাড়া এই অভিসন্দর্ভ নির্মিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিভাগের অন্যান্য স্যার ম্যাডামদের কাছ থেকেও আমি যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি , যা আমার এই গবেষণার কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল ।

এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার জন্য সর্বপ্রথম যার সাথে আলোচনা করি সে হল আমার অনুজ প্রতিম নির্মাল্য কুমার ঘোষ। নির্মাল্য আমাকে নানান পরামর্শ দিয়েছিল এবং উৎসাহ জুগিয়েছিল। তার এই অবদান ভোলার নয়।

ভারতী চতুষ্পাঠী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান তন্ময় রায়ের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। নবদ্বীপের বর্তমান টোল, চতুষ্পাঠী সংক্রান্ত নানা তথ্য তিনি আমায় দিয়ে ঋদ্ধ করেছেন। ধন্যবাদ জানাই আমাকে ক্ষেত্র সমীক্ষায় সাহায্যকারী তথ্যদাতাদের।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ , রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার , গোলপার্ক ; জাতীয় গ্রন্থাগারের সকল কর্মীদের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক আইভি আদক ও হরিশ মন্ডলের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । একাধিক বইয়ের সন্ধান দিয়ে তারা বিভিন্ন সময়ে আমায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ।

পরিশেষে আসি আমার পরিবারবর্গের কথায়, এঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার স্বামী অর্ণব গোস্বামীর নিরন্তর সহযোগিতা আমার এই গবেষণা

কর্মের অন্যতম প্রাপ্তি। গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রুফ সংশোধন , সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন প্রভৃতি সকল বিষয়েই যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন তিনি। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমার পরিবারস্থ মানুষগুলির আন্তরিক সাহায্য এবং নিরন্তর উৎসাহ ব্যতীত আমি এই গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে পারতাম না।

বন্ধুদের মধ্যে বিশেষত সঞ্চারী পুরকাইত এবং সঞ্চারী বোরালের নাম আগে না উল্লেখ করলেই নয়। এদের মধ্যে প্রথমজন আমার সহপাঠী। মূলত তার সাহায্যেই আমি পৌঁছাতে পেরেছি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী অফিসে এবং সংগ্রহ করতে পেরেছি প্রচুর তথ্য। অপরজন আমার অনুজা প্রতিম। সঞ্চারী গবেষণা সংক্রান্ত নানা তথ্য দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও বলতে হয় ভাস্কর , সুমন , নয়না , অর্ণব , আলোকপর্ণাদির কথা। সময়ে অসময়ে বিভিন্ন আবদারের অত্যাচার সহ্য করে আমাকে প্রশয় দিয়েছে সকলে। এদের প্রত্যেকের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র

১.. ১

ভূমিকা ১

২ ....১১

প্রথম অধ্যায়..১১

অষ্টাদশ পূর্ববর্তী শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ..১১

২.১) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যানুসারে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষক সমাজ ১১

২.২) আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিক্ষাজগৎ ও শিক্ষকসমাজ..২৫

৩ .... ৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৭

ঊনবিংশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষক সমাজ.. ৩৭

৪ .... ৬২

তৃতীয় অধ্যায় ৬২

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ ও শিক্ষকসমাজ.. ৬২

৪.৩) তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে শিক্ষক সমাজ ৮০

৫ ....১০২

৪র্থ অধ্যায় ১০২

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষা জগৎ এবং শিক্ষক সমাজ..১০২

৬ .... ১৪২

পঞ্চম অধ্যায়.. ১৪২

বাংলা কথাসাহিত্যে নারী শিক্ষা জগৎ এবং শিক্ষিকা সমাজ.. ১৪২

৭ ....১৫৬

উপসংহার..১৫৬

পরিশিষ্ট..১৫৮

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান রূপ..১৫৮

মকতব এবং মাদ্রাসার বর্তমান রূপ..১৫৮

সাক্ষাৎকার ১..১৫৮

টোল , চতুষ্পাঠীর বর্তমান রূপ.. ১৬৩

সাক্ষাৎকার ২ .... ১৬৩
তথ্যদাতার পরিচয়ঃ দেবজ্যোতি মিশ্র.. ১৬৩
মকতব মাদ্রাসার চিত্র...১৬৫
টোল চতুষ্পাঠীর চিত্র ১৬৭
শিক্ষা পদ্ধতির কালানুক্রমিক বিবরণ...১৬৯

১
ভূমিকা

সাহিত্য সমাজকে প্রতিফলিত করে । সমাজ থেকে রসদ সংগ্রহ করে সাহিত্যিক সৃজন করেন তাঁর সাহিত্য । সেকারণেই সাহিত্যে সমাজের বিভিন্ন অংশকে দেখতে পাওয়া যায় । সমাজেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শিক্ষা। কারণ, শিক্ষার মানের উপর নির্ভর করে দেশের সংস্কৃতির মান, চিন্তার মান , বুদ্ধির মান । শিক্ষা মানুষকে , মানবসমাজকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে , উন্নীত করে , সংস্কৃতিবান করে , সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। জীবনকে ও সমাজকে সুন্দর ও বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রকৃতির নিয়মকে জেনে তাকে পরিবর্তন করার যে সংগ্রাম মানুষকে করতে হয়েছে বা হচ্ছে ,তাই শিক্ষা। অর্থাৎ, মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার আদর্শ এবং লক্ষ্য । এই আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষককুলের । কারণ, গুরু বা আচার্যের কাছে থাকে সভ্যতার বিকাশ ও প্রগতির সংগোপন সূত্র। শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কুলচূড়ামণি। শ্রেষ্ঠত্বের এই আসন গ্রহণ করার জন্য শিক্ষক সম্প্রদায়ের অগাধ পাণ্ডিত্যসহ কয়েকটি আবশ্যক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন । সমাজে উচ্চ আদর্শকে প্রোথিত করার মতো কিছু বৃত্তিগত দায়িত্ব শিক্ষকদেরও থেকে যায়। যদিও বৃত্তিগত এসকল দায়িত্ব সবটাই শিক্ষকের স্বেচ্ছাকৃত এবং বিবেকের উপর নির্ভর করে।

সামাজিক আদর্শ সমূহকেকে শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। অথচ আমাদের দেশে অনেক সময়ই শিক্ষার প্রসঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে । শিক্ষক-অধ্যাপকের স্থান সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে থেকেছে।

পরিবর্তনই পরিবেশের ধর্ম। জগতের অংশ রূপে পরিচালিত শিক্ষাজগতেও সে পরিবর্তনের স্পর্শ এসে লাগবে সেটাই স্বাভাবিক। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত থাকে আর্থ –সামাজিক প্রেক্ষাপট । সামাজিক অগ্রগতি শিক্ষার ধারাতেও পরিবর্তন এনেছে। এক যুগের সীমাবদ্ধতা পরবর্তী সময়কালে ধরা পড়েছে, মানব সভ্যতার প্রয়োজনে তখন সেই শিক্ষাকে আরো সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষাই ছিল মানব সভ্যতার কাছে এক সময় হাতিয়ার । এর সাহায্যেই মানুষ সমাজ ও জীবনের নানা সমস্যা দূর করেছিল প্রাচীন যুগে । শিক্ষার এই ধারা বেয়ে এরপরে সমাজে এসেছে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা । এই পর্যায়ে জীবনের নানা সঙ্কট মেটাতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকেই পাথেয় রূপে গ্রহণ করেছে সমকালীন সমাজ।

অর্থনৈতিক অবক্ষয়ে ভুগতে থাকা একটি বৃত্তির উপর সুকৌশলে মহত্ত্বের আদর্শ লেপন করার একটা প্রবণতা অনবরত রয়ে যায় সমাজে । শিক্ষকতা বৃত্তিটির ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা প্রযোজ্য হয়েছে। সামাজিক উচ্চাসনে থাকা শিক্ষক সমাজ কখনো থেকেছেন অভুক্ত, আবার কখনো জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য বিদ্রোহের পথে নামতে হয়েছে তাঁদের। আবার কখনো বা ভোগবাদী সমাজের লালাসার ফাঁদে পা দিয়ে শিক্ষক সম্প্রদায় কর্তব্যের পথ থেকে সরেও দাঁড়িয়েছেন । সমাজের দর্পণ রূপে প্রতিভাত সাহিত্যে তার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের সাহিত্য কোনটিই তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যে শিক্ষক চরিত্রের সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রতিষ্ঠিত সকল সাহিত্যিকের রচনা সম্ভারে শিক্ষক শ্রেণী স্থান করে নিয়েছেন। ‘ ব্যক্তির কথা হচ্ছে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু , আর প্রাতিস্বিকতার ধারণা দেশ ও কালের নির্দিষ্টতার উপর নির্ভর করে’। বর্তমান অভিসন্দর্ভে সমসাময়িক সমাজ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাজগতের

স্বরূপ কেমন ছিল , সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের অবস্থান কেমন ছিল এবং বাংলা কথাসাহিত্যে তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা নিরূপণ করার প্রচেষ্টা থাকবে।

২

' উপন্যাসে সময়ের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে নির্ঘাত , সময়কে বাদ দিয়ে কোনো উপন্যাসই লেখা হতে পারে না'।[১] অর্থাৎ, কথাসাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্য নির্মাণকালে সময়কে অস্বীকার করা অসম্ভব। যেহেতু উপন্যাসের শরীরে শ্বসনের মতো সময় অন্তঃবহমান অশরীরী অথচ অমোঘ অস্তিত্ব হয়ে ওঠে , তাই উপন্যাস সমালোচনা কালেও তা একটা বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মধ্যে রচিত এই বাংলার সেইসমস্ত কথাসাহিত্যগুলিকেই গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে আখ্যান হিসেবে শিক্ষাজগতের কথা আছে এবং প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে শিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন। সমাজের নিপাট যুগ বিভাজন সম্ভব নয়। একটা যুগের মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে তেমনি এক যুগের কিছু লক্ষণ কিছুটা হলেও অন্য যুগে তার ছাপ রেখে দেয়। আবার এক একটা যুগের আর্থ- সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ এক এক ধরনের চরিত্র গড়ে তোলে। তাই প্রাচীন যুগের শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার নিয়ন্ত্রক গুরু সময়ের সাথে বিবর্তিত হয়ে শিক্ষক , মাষ্টারমশায় বা স্যারে এবং শিষ্য যদি পরিবর্তিত হয়ে ছাত্র , পড়ো বা স্টুডেণ্টে পরিণত হয় তাহলে সেই চরিত্র বিশ্লেষণ করলে সমকালীন সময় যেমন উঁকি মারবে , সেই সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যের একটা সূক্ষ্ম ধারাও সেখানে থাকবে এটা অনুমান করা যায়।

সাহিত্যে শিক্ষক চরিত্র নির্মাণকালে সমসাময়িক সময় কিভাবে ক্রিয়াশীল, দেশ-কালের পরিবেশ পরিস্থিতি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে – সেটাই বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয় । এই আলোচনার পরিধিতে দুই বাংলার কথাসাহিত্য নয় এই বাংলার কথাসাহিত্যকেই আলোচ্য বিষয়বস্তু করা হয়েছে।

৩

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য প্রভাবে এবং প্রাচ্য প্রাচীন সাহিত্যের ধারা বেয়ে বাঙলা কথাসাহিত্যের জন্ম হয়। উপন্যাসের সৃষ্টির কেন্দ্রে রয়েছে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা , ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। সমাজ বিকাশের ধারায় একদিন ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের স্থানে নিজের চাহিদা নিয়ে হাজির হল উপন্যাস। মধ্যযুগীয় সমাজ কাঠামোয় রাজতন্ত্রী অভিজাতদের ছত্রছায়ায় নয় বরং উপন্যাসের জন্ম সম্ভব হয়েছে ধনতন্ত্রের বণিকতন্ত্রের প্রসারণের সময় মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জন্মলাভের ফলে ।

কথাসাহিত্য রচনার সময়ে যে প্রধান উপাদানগুলি অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হয় তা হল প্লট বা আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ ,সময়, ঘটনাস্থল, পরিবেশ ও গল্পের এক সামগ্রিক সুর । এর সঙ্গে যুক্ত হয় জীবন সম্পর্কে কথাকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা , বিচিত্র মানুষের সমাহার নিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় উপস্থিত হল জীবনের শিল্পীত রূপ উপন্যাস। সমাজতত্ত্ব ,মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, কি না আছে সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভারে? আর এই সম্ভারে সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষক চরিত্র না থাকাটাই অস্বাভাবিক।

প্রাচীন গুরুকুলীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষককে ত্রিদেবের সাথে সমীকৃত করে ধরা হতো। রাজতন্ত্র থাকলেও গুরুই ছিলেন সমাজের নিয়ন্ত্রক । শিক্ষা প্রক্রিয়াকে পবিত্র হিসেবে

গ্রহণ করা হতো বলেই তা নানা সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। স্বভাবতই সে যুগের সাহিত্যে মর্যাদার সঙ্গে আঁকা হয়েছে শিক্ষক চরিত্রকে।

মধ্যযুগে বাংলায় মুসলিম আক্রমণে এবং তাদের বিজয়ে আধিপত্য বিস্তারিত হয় ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতির। ফলত সেসময় মকতব, মাদ্রাসা নামক নতুন শিক্ষা পদ্ধতির সাথে পরিচিত হল বাঙলার সমাজ।

ঊনবিংশ শতকে ঔপনিবেশিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ব্রিটিশদের আগে মিশনারিদের হাত ধরে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় মেকলের মিনিটের মধ্যে ইংরাজি সরকারি ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলে দীর্ঘ প্রচলিত সংস্কৃত , আরবি , ফারসি ভাষা সমন্বিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়তে থাকে। স্বভাবতই ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে দেশীয় গুরুমশায়দের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে ।

বিংশ শতকের ভারতবর্ষের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্তি। পরাধীন ভারতের শিক্ষাজগতের রূপ ছিল একরকম । শিক্ষা হয়ে উঠেছিল চাকরি পাবার হাতিয়ার স্বরূপ ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষের দশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সময় ছিল অত্যন্ত অস্থির এবং সংকটময়। নানা জটিল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ,অসন্তোষ ,আশঙ্কার মধ্য দিয়ে শাসক ও শাসিত উভয় গোষ্ঠীর সময় কাটছিল। বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও সে সময় কম উত্তপ্ত ছিল না। দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে ভারতে সবথেকে ক্ষতি হতে শুরু হয়েছিল আর্থিক দিক থেকে। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মূদ্রাস্ফীতি বাংলার কৃষি-প্রধান গ্রামগুলিকে দীর্ণ করে দিয়েছিল। বেকারি, মন্বন্তর, কালবাজারি , চোরা কারবার, বোমার আতঙ্ক, বোমা বর্ষণ – এসকল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়া সমাজ

কোনক্রমে এগিয়ে চলছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মদতপুষ্ট জমিদার-জোতদারদের অত্যাচারও ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষার অবস্থাও ছিল তথৈবচ। এই কাল পর্বে শিক্ষকদের চাকরির অবস্থা ছিল শোচনীয়, বেতনও আকর্ষণীয় ছিলনা । পেশাগত স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা, আয়ের সুরাহার অভাবের কারণে কোন যোগ্য ব্যক্তি জীবনধারণের উপায় রূপে এই বৃত্তির দিকে অগ্রসর হতে চায়নি। বেসরকারি স্কুলের অবস্থাও ছিল অনুরূপ , কখনো আবার এর থেকেও শোচনীয়। যে সকল শিক্ষক স্কুলে যুক্ত ছিলেন তাঁদের ট্রেনিং ব্যবস্থার অভাব ছিল। অতি সামান্য বেতন, চাকরির অনিশ্চয়তা ,পেন্সন বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থার অভাব সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের শোচনীয় অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

স্বাধীন ভারতে , বিগত শতকের প্রবাহমান অর্ধ-ঔপনিবেশিক , অর্ধসামন্ততন্ত্র আশ্রয়ী ব্যবস্থাকেই সামান্য বিবর্তিত , সম্প্রসারিত করে চালানোর চেষ্টা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দেশনায়কেরা শিক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষা নিয়ে এটুকুই করেছিলেন । শিক্ষার উপরেই নির্ভর করে জাতীয় অগ্রগতির সম্ভাবনা। শিক্ষাপ্রণালীকে আর্থিক সামাজিক প্রগতির পরিকল্পনার সাথে গাঁথা কিংবা বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পাঠক্রম , নিষ্প্রাণ নিয়মনিষ্ঠ পরীক্ষাব্যবস্থা, কোন কিছুই দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা বা অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না স্বাধীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি ।

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটিও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। বৈদিক সাহিত্যে নারী শিক্ষার প্রামাণ্য বিবরণ রয়েছে। মনুর যুগ থেকে নারী শিক্ষার অবনমনের সূত্রপাত ঘটলেও ফল্গুধারায় তা বহমান ছিল। উনিশ শতকে নারীশিক্ষার জন্য সহৃদয় মানুষের সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতকে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক অবস্থা,

দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, প্রভৃতি ঘটনা নারীকে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেয় । বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা বৃত্তিটিকেও নারীকে গ্রহণ করতে দেখা যায়।

বিংশ শতকে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন শক্তিশালী লেখক । তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে সে যুগের সমাজপিষ্ট শিক্ষকদের অকথ্য জীবন যন্ত্রনা। যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন সেই জীবন যন্ত্রণার নেপথ্যের কারণ এবং পরিবেশ-পরিস্থিতিকে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য হল তার স্বরূপ নির্ণয়। অর্থাৎ ,সমসাময়িক সমাজ , দেশ কাল কথাসাহিত্যে শিক্ষক চরিত্র নির্মাণ কালে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শিক্ষক চরিত্র নির্মাণে কথাসাহিত্যিকগণের মনোভাব ,তাঁদের ধ্যানধারণা , তাঁদের অভিমতকে বিশ্লেষণ করা হবে এই অভিসন্দর্ভে ।

৪

কোরক সাহিত্য পত্রিকা – প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৯ - 'শিক্ষা – শিক্ষণ – শিক্ষকতা' সংখ্যায় প্রাবন্ধিক প্রসূণ ঘোষ শিক্ষক–ছাত্র সম্পর্কসূত্রের তিনটি পর্ব নির্ণয় করে শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান লিপিবদ্ধ করেছেন ।

চন্ডিকাপ্রসাদ ঘোষালের লেখা 'শিক্ষকতার সেকাল' (সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি) শীর্ষক প্রবন্ধেও শিক্ষকজীবনের অবমাননাকর দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন সমাজের তথাকথিত সম্ভ্রান্তদের কাছ থেকে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত

হবার অনুজ্ঞা লাভ করতে শিক্ষকেরা অভ্যস্ত । অথচ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার মতো উৎস আছে কিনা তা কখনো খতিয়ে দেখার প্রয়াস নেই সমাজে । দরিদ্র শিক্ষককুলকে অনেকসময় এ বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে ‘পেটের দায়ে’ ।

দীপ্তেন্দ্র সরকারের ‘গুরুমশাইয়ের গুরুত্বহানী’ প্রবন্ধেও শিক্ষক চরিত্রের উপর আলোকপাত করা হয়েছে ।

তথ্যগত এবং তত্ত্বগত উপাদানরূপে উল্লেখিত আলোচনাগুলি থেকে দান গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু বা অভিমুখ অন্য। এই গবেষণায় বিশ্লেষন করা হবে কথাসাহিত্যে শিক্ষকজীবন এবং শিক্ষাসমস্যা কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং কথাসাহিত্যিকগণ শিক্ষক চরিত্র নির্বাচন কালে কোন দিকে লক্ষ্য রেখেছেন । এই বিশ্লেষণের জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে --

১) ভূমিকা

২) প্রথম অধ্যায়

অষ্টাদশ পূর্ববর্তী শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

২.১) প্রাচীন সাহিত্যানুসারে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

২.২) আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

৩) দ্বিতীয় অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্য সাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

৪) তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

৪.১) রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র সমসাময়িক কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

৪.২) রবীন্দ্র পরবর্তী কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

৪.৩) তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

৫) চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

৬) পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে নারীশিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

৭) উপসংহার

৬

যে কোনো গবেষণা পর্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উৎস নির্ধারণ ও গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণ । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই সন্দর্ভে এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে উল্লেখপঞ্জি ও টিকা অংশে সূত্রাকারে উৎস নির্দেশ করা হয়েছে । গ্রন্থপঞ্জি নির্দেশ যেকোনো গবেষণারই এক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । এই গবেষণা কর্মে মুদ্রিত মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া উভয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । এই গ্রন্থপঞ্জি

নির্মাণ কালে দুটি মাধ্যমকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের উদ্দেশ্যে এই গবেষণা কার্যে এম এল এ স্টাইল শিট অনুসরণ করা হয়েছে । যেসব গ্রন্থ এই গবেষণার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে সেই গ্রন্থগুলিকে আকরগ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে । গ্রন্থের পরে আসে পত্রিকা প্রসঙ্গ। পত্রিকাগুলিকেও আলাদা ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । প্রিন্ট মিডিয়া প্রসঙ্গের পরে আসা যাক ইলেকট্রনিক মিডিয়া সম্পর্কে আলোচনায় । বর্তমান কালে যেকোনো গবেষণাতেই ইলেকট্রনিক মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এই গবেষণাও তার ব্যতিক্রম নয় । সেই কারণে গ্রন্থপঞ্জিতে ইলেকট্রনিক উৎস নির্দেশ করা হয়েছে।

দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে গবেষণা কর্মটিকে সুসম্পন্ন এবং ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে এই গবেষণাকর্মে, যেগুলি নিয়ে ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের ইচ্ছে থাকবে বর্তমান গবেষকের। চেষ্টা করা হয়েছে নির্ভুল পাঠ তৈরীর কিন্তু তা সত্ত্বেও যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল সে দায় বর্তমান গবেষকের-ই।

উৎস ও তথ্য নির্দেশ

১) রায়. অলোক(সম্পাঃ), ‘কথাসাহিত্য সাহিত্যকোষ’, সাহিত্যলোক, ১৩৬৭, পৃ- ৩৯

২
প্রথম অধ্যায়
অষ্টাদশ পূর্ববর্তী শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষকসমাজ

২.১) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যানুসারে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষক সমাজ

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার প্রামাণ্য ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায় বেদের যুগ থেকেই। দশটি মণ্ডলে বিভক্ত সহস্রাধিক মন্ত্রের বা ঋকের সংকলনযুক্ত ভারতীয় সাহিত্যধারার আদিমতম নিদর্শন ঋগ্বেদ , পৃথিবীরও প্রাচীনতম গ্রন্থ । আর্য ঋষিদের জীবন এবং জগৎ সম্পর্কিত আধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উত্তর থেকেই জন্ম নেয় বেদ এবং বেদকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা। পৌরোহিত্যকর্মকে সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের জন্য বৈদিক যুগে প্রথমে শিক্ষার আয়োজন হয় । ধর্মীয়-আচারসর্বস্ব সমাজে শিক্ষার্থীকে বেদ সম্মতভাবে যজ্ঞপদ্ধতি জানতে হতো। বেদ শিক্ষার অনুশীলন পর্ব চলতো শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন প্রভৃতি প্রক্রিয়া সমূহের মধ্যে দিয়ে।

আর্যদের ভারতবর্ষে আসার আগেই ভারতীয় সভ্যতার একটি নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা ছিল । আর্যদের আগমনে বিরাজিত এই ধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তাঁদের শিক্ষা সংস্কৃতি । এই দুই সভ্যতার সমন্বয়ে সৃষ্ট সভ্যতা অভিহিত হয় ভারতীয় সভ্যতা নামে । আর নবসৃষ্ট এই সভ্যতার মধ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম হয় সেটাই বৈদিক শিক্ষা। সেকারণেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা করতে গেলে সিন্ধু ও আর্য – এই দুই সভ্যতার উপাদানের মধ্যেই সে তথ্য অনুসন্ধান করা সমীচীন হবে । সিন্ধু

সভ্যতার প্রামাণ্য কোন শিক্ষাব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়নি ঠিকই কিন্তু সিন্ধুদের নগর সভ্যতার প্রশংসা করতে দেখা গেছে আর্যদের। উন্নত সমাজ সংস্কৃতি যেহেতু উন্নত শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে তাই এ কথা অনুমান করে নিতে পারা যায় যে, যে সভ্যতায় উন্নত নগর কেন্দ্রিক জীবনের নিদর্শন আছে সে সভ্যতায় উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা থাকাই স্বাভাবিক ।

প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক শিক্ষাদর্শন তৎকালীন যুগের ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিল । বৈদিক ভারতবর্ষে সমাজ জীবন , রাজনৈতিক জীবন , ধর্মীয় জীবন একই খাতে প্রবাহিত হত। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি স্তরে ধর্মীয় জীবনের প্রভাব সুস্পষ্ট । সপ্তসিন্ধুর প্রাচুর্যের কারণে আর্যদের জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়নি । দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য থাকায় জীবন জিজ্ঞাসা তাদের কাছে প্রবল হয়ে ওঠে যার সমাধানে তারা গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। [১] তাঁদের জীবন দর্শন ছিল ‘Plain living and high thinking’।

আর্যঋষি পরিবারেই প্রথম শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে । আর্য ঋষিরা ছিলেন মূলতঃ পুরোহিত , ধর্মের ধারক ও রক্ষক এবং তাঁরা মন্ত্র রচনা করতেন। এসকল আর্য ঋষিগণ ধ্যানস্থ হয়ে বেদের বাণীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে গুরুকে তিন দেবের সমকক্ষ ধরা হয়। কঠোপনিষদে’র একটি শ্লোকে বলা হয়েছে -

“ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয় বহুধা চিন্ত্যমানঃ ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি
অনীয়ান হ্যতরকমনুপ্রমাণাত ।। [২.৮]

অর্থাৎ, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি উপদেশ দিলে বহু চিন্তা করলেও এই ব্রহ্মাকে জানা যায় না। যে আচার্য নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করেন না এইরূপ ব্যক্তি উপদেশ দিলে ব্রহ্মকে নিঃসংশয়ে জানা যায়। ইনি অণু হইতেও অণু , এজন্য তর্কের গোচর নহেন।[২] সমাজে গুরুর স্থান ছিল সর্বোচ্চে , তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র । 'বায়ুপুরাণ'-এও গুরুর প্রাজ্ঞতা কে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যাঁহারা বৃদ্ধ , অলোলুপ, জিতেন্দ্রিয় ,দম্ভহীন সুশিক্ষিত ও সরলচেতা তাহাঁরাই আচার্য পদবাচ্য। যিনি আচার্য , তিনি আচার পালন করেন ,অপরকে আচারে প্রবর্তিত করেন। বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা বলে এরা পরিচিত হতেন ঋষি নামে । মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং তাঁদের বংশধরেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রচনা করেছেন বেদের মন্ত্রগুলিকে । এ সকল আর্য ঋষি পরিবারের মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যায় ভারতের আদিমতম শিক্ষালয় 'গুরুকুল' এবং 'আচার্য'-দের। গুরুর আসন গ্রহণ করতে হলে তাকে জ্ঞানী হতে হবে।

প্রাচীন ভারতীয় আদি বৈদিক যুগে এবং পরবর্তী বৈদিক যুগেও এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল মোক্ষলাভ বা পরমের সঙ্গে মিলিত হওয়া। 'আত্মানং বিদ্ধি '(to know thyself) এবং আত্মোপলব্ধি (self-realisation) -র মাধ্যমে তা সম্ভব। গুরুগৃহে শিক্ষার্থীকে প্রেরণ করা হত শিক্ষার এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে । নবীন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা 'বিদ্যারম্ভ ' বা 'অক্ষর স্বীকরণ ' সংস্কার শুরু হত পাঁচ বছর বয়সে 'চূড়াকর্ম ' বা 'চৌল কর্মের 'মধ্যে দিয়ে । শিশুর প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবারের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল । ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় পাঁচ থেকে বারো বছরের মধ্যে গৃহের শিক্ষা সমাপ্ত করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় , বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর ব্রহ্মচারী উচ্চতর শিক্ষার জন্য তপোবনে গুরুকুলে যোগদান করত । পণ্ডিতদের সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত 'অগ্রহার গ্রাম' গুলিতে গুরুকুল সৃষ্টি হত । গুরুকুলের ব্যয়ভার বহন করা রাজাদের একটি

অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। আচার্যগণকে রাজার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে স্বাধীনতা হরণ কিংবা শিক্ষাকে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণে আনার কোন অভিসন্ধি থাকতো না। ঋগ্বেদের যুগে সমাজ ছিল মূলত ধর্ম আশ্রয়ী সেকারণেই রাজতন্ত্র (১০/১৭৩ ; ১০/১৭৪ ঋগ্বেদের রাজার উদ্দেশ্যে রচিত শ্লোক প্রমাণ দেয় রাজতন্ত্রের) প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজের চালিকা শক্তি ছিল মূলত সমাজ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণীর হাতে। জ্ঞানী এই গুরু বা আচার্যগণই সমাজশ্রেষ্ঠ ছিলেন ।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় 'উপনয়ন ' একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান ছিল যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ছাত্র জীবনের জন্য দীক্ষিত করা হত , শিক্ষার্থী লাভ করত দ্বিতীয় জন্ম । এই দ্বিজত্ব তাকে দান করতেন গুরু বা শিক্ষক। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ,ক্ষত্রিয় , বৈশ্য এই তিন বর্ণের সন্তানদের যথাক্রমে আট , এগারো এবং বারো বছর বয়সে উপনয়ন দেওয়া হতো । গুরুকুলে 'উপনয়ন ' প্রথার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর যে শিক্ষার প্রারম্ভ হত কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং সংযমের মধ্যে যাপিত আন্তেবাসী সেই জীবনের সমাপ্তি হত 'সমাবর্তনে'র পর। সমাবর্তনের সময় গুরু শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিতেন । "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া' - শিষ্যকে অন্ধকার থেকে অলোকের পথে নিয়ে যাওয়াকে সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করতেন বেতনহীন আচার্যগণ । গুরুগৃহে সম্পূর্ণ ব্যয়হীন শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থী শিক্ষককে গুরুদক্ষিণা প্রদান করতো । বৈদিক যুগে গুরু – শিষ্য সম্পর্ক ছিল পবিত্র ,মধুর এবং পিতা-পুত্রের মতো।

"আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানং বোধাদপি গরিয়সী " - বৈদিক যুগের শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম ছিল আবৃত্তি । শ্লোকের প্রত্যেকটি পদ প্রথমে ছন্দ সহকারে আবৃত্তি

করানো হতো এবং পরে শব্দ ও স্তবকগুলোকে ছন্দ সহকারে আবৃত্তি করতে হত । শিক্ষার্থীগণ গুরুর কাছ থেকে শুনে সমষ্টিগতভাবে সেগুলি আবৃত্তি করতেন ।

সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় , রাজশক্তির আনুকূল্যে , শিক্ষকের পূর্ণ কর্তৃত্বে সৃষ্ট বৈদিক শিক্ষাব্যাবস্থা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট ছিল । তিনটি উচ্চ বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এই শিক্ষা থেকে শূদ্ররা দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল । অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থার আদিমতম নিদর্শনে দেখতে পাওয়া যায় একটা শ্রেণীকে শিক্ষাগ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে । বৈদিক যুগের প্রথমদিকে নারীশিক্ষার নিদর্শন থাকলেও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং সূত্র সাহিত্যের যুগে নারীর বেদ পাঠের অধিকার খর্ব করা হয়। ফলত গণশিক্ষার প্রসার ঘটেনি। বৈদিক যুগের সূচনালগ্নে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিকি জীবনই আর্যদের সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। সমাজের একজনের পক্ষে সমস্ত কাজ করা সম্ভব ছিল না । আদি বৈদিক স্তরে মানুষের গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজে যে বর্ণবিভাগ ছিল সেখানে যোগ্যতা অনুসারে যে কোন বর্ণের লোক যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারত [৩] । বর্ণ বিভাগ থাকলেও তা পুরুষানুক্রমিক হয়ে ওঠেনি তখনও । (৯/১১২[১,২,৩]) একই পরিবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারী ব্যক্তির উল্লেখ আছে বেদে । (৭/৮৮/৪) [৪] কিন্তু পরে এই কর্মভিত্তিক বর্ণবৈষম্যই পরিণত হল জন্মভিত্তিক বর্ণবৈষম্যে যা প্রভাবিত করল পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যাবস্থাকেও । শিক্ষা ব্যবস্থাও ক্রমশ জটিল হয়ে পড়েছিল । কারণ, বৈদিক সমাজ ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছিল। ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে বহু পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায় । এসকল পুরোহিতগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল – উদ্গাতা , হোতা , ইত্যাদি। এঁরা তিন

বেদে পারদর্শী ছিলেন । এঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁকে বলা হত ব্রহ্মা । ব্রহ্মা চার বেদেই পারদর্শী এবং সর্ববিদ্যাবিশারদ হতেন ।

বৈদিক যুগেই সামাজিক বর্ণবৈষম্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রম রচনার প্রবণতা দেখা দেয় । ব্রাহ্মণদের জন্য তৎকালীন সমাজে তিনটি কর্মের দায়ভার নির্দিষ্ট ছিল- যজ্ঞ , অধ্যাপনা ,এবং দান গ্রহণ। মনুর সংহিতায় তাই স্পষ্টতই নির্দেশিত হতে দেখি ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর অধ্যাপনার অধিকার নেই । মহাভারতে সেরূপভাবে সরাসরি উল্লেখিত না হলেও মনু স্মৃতিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দেবার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণেরই আছে।[৫] (২/৯০) মনু এও নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষা দেবার জন্য উপযুক্ত শিষ্য না পেলে অপাত্রে বিদ্যার বীজ যেন বপন না করেন ব্রহ্মবাদীরা। ("বিদ্যয়ৈব সমঙ কামং মরত্তব্যন ব্রহ্মবাদিনা ।/ আপদ্যপি হি ঘোরায়ান ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ।।[৬] (২/১১৩)) মহাভারতের যুগেও কর্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগ হলেও সাধারণত ব্রাহ্মণ শ্রেণীই শিক্ষক বা আচার্য হবার উপযুক্ত ছিলেন । অবশ্য, মহাভারতে কিছু কিছু ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণী শিক্ষকতার কাজ করেছেন । ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র শ্রেণীও কর্মের গুণে ব্রাহ্মণের ন্যায় শিক্ষা দেবার অধিকার অর্জন করেছে । রাজর্ষি জনক ক্ষত্রিয় হয়েও শুকদেবকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন । দাসীপুত্র বিদূরও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ।

মহাভারত পর্বে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা প্রদানকে শূদ্রের কাজ বলে বিবেচনা করা হতো । মনুর নির্দেশেও বলা হয়েছে বিষয়সেবায় আসক্তদের বেদাধ্যায়ন , দান, যজ্ঞ , বিষয় , তপস্যা কখনই সিদ্ধ হয় না । (৯৭)[৭] পরবর্তীকালে একই মতকে সমর্থিত হতে দেখি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' –এ । সেখানেও শিক্ষার বিনিময়ে অর্থ রোজগারকে

ব্যাবসায়ী মনোবৃত্তি বলা হয়েছে । ("...যার বিদ্যা শুধুমাত্র জীবিকার জন্য তোলা থাকে তাকে (পণ্ডিতেরা) জ্ঞান – পণ্যের বণিক বলেন")[৮] মহাভারত পর্বে শিক্ষার দুই রকম নিয়ম ছিল, গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ অথবা গৃহশিক্ষক রেখে বিদ্যাচর্চা । গৃহশিক্ষক সাধারণত ধনী পরিবারই নিযুক্ত করতো ।শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার ছিল না কিন্তু বারো- তেরো বৎসর বয়সে শূদ্র সন্তানেরও বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হতো ।

গুরুভক্তি এবং গুরু অনুজ্ঞা পালনের কাহিনী হিসেবে উপাধ্যায় ধৌমের তিন শিষ্য আরুণি, উপমন্যু, বেদের কাহিনী সর্বজন বিদিত। গুরু নির্দেশ পালন-এর জন্য কঠোর পরীক্ষা তাদের দিতে হয়েছিল। কিন্তু কেন কঠোরতা? এর উত্তরও বহু পূর্বে মনুর স্মৃতিতে দেওয়া হয়েছে এইভাবে তপস্যা বৃদ্ধির জন্য কঠোর নিয়ম পালন জরুরি শিক্ষার্থীর । গুরুর প্রতি ভক্তি এবং আনুগত্য রাখাও কর্তব্য শিষ্যের।

মনু, অনধ্যায় দিবসেও কিছু কিছু বিষয় অধ্যয়ন করার বিধান দিয়েছেন । কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন বিরামের ফলে নিত্যতা থাকে না পাঠে।[৯] (২য় অধ্যায় ১০৫ এবং ১০৬ নং শ্লোক) (বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।/নানুরোধোহস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি ।। (২/ ১০৫) নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রন হি তৎ স্মৃতম । ব্রহ্মাহুতিহুতন পুণ্যমনধ্যায়ষটকৃতম ।। (২/১০৬)

ধার্মিক অধ্যাপক দুর্বৃত্ত শিষ্যকে রজ্জু কিংবা বেণুদল দ্বারা মস্তক ভিন্ন অন্য স্থানে শাসন করিবেন এবং শিষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগও করবেন না। (২/১৫৯) (অহিংসয়ৈব ভূতানান কারজন শ্রেয়োহনুশাসনম।/বাক চৈব মধুরা শ্লক্ষ্মা প্রযোজ্যা ধর্মমিচ্ছতা ।।[১০]

গুরুদক্ষিণা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – শিষ্য শক্ত্যানুসারে ক্ষেত্র, গো, অশ্ব, ছত্র, চর্মপাদুকা, আসন, বস্ত্র যা কিছু হোক শিক্ষা সমাপনে গুরুকে দক্ষিণা স্বরূপ দিয়ে প্রীত করবে। সমগ্রদানে অসমর্থ হলে ও ছত্র এবং পাদুকা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল । (২/২৪৬)[১১]

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাধারায় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া অন্য যে ধারাটি উল্লেখযোগ্য ছিল সেটি হল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা । হিন্দুধর্মের শিক্ষার মতোই এই শিক্ষাব্যবস্থাও ধর্মকেন্দ্রিক। বৈদিক যুগের সমাজে দুটি শ্রেণীবিভাগ ছিল । প্রথম শ্রেণী সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও তারাই ছিলেন সমাজ পরিচালক । সামাজিক দিক শিক্ষার দিক থেকে উন্নত , সংস্কৃত ছিল তার ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। দ্বিতীয় শ্রেণী, স্থানীয় ভাষায় কথা বলতো এবং সংখ্যায় ছিল বেশী কিন্তু শিক্ষার অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত । বৈদিকযুগের শেষের দিকে হিন্দু সমাজ ক্রমশ জটিল এবং আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্বও হয়ে পড়েছিল । এরকম একটি পরিস্থিতিতে গৌতম বুদ্ধ প্রচার করলেন বৌদ্ধধর্মের ।“It was Goutam Buddha who rose in open protest against the power and ritual of the Brahamanas and thus introduced a new force into Indian life and thought ”[দীনেশ চন্দ্র সেন] ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের । স্বাভাবিকভাবেই ধর্মক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিক্ষাক্ষেত্রকেও স্পর্শ করে ।

বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য ছিল নির্বাণ যা তাদের শিক্ষাজগৎকেও প্রভাবিত করেছিল । তাদের শিক্ষার পরম লক্ষ্য ছিল সংসার বন্ধন থেকে চুড়ান্ত মুক্তির মাধ্যমে পরিনির্বাণ লাভ । বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল বিহার বা সংঘারাম । বৌদ্ধদের এই বিহার বা সংঘারামগুলি রাজা, মহারাজা, শ্রেষ্ঠী এবং জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হত । এগুলিই ক্রমে ক্রমে মহাবিহারে পরিণত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় । হিন্দু শিক্ষার মতো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনও শুরু হত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ‘প্রবজ্যা’র মধ্য দিয়ে এবং সমাপ্তি ঘটত ‘উপসম্পদা’র মধ্য দিয়ে । বৌদ্ধ শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ছিল মূলত মৌখিক । মুখে মুখে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হতো ত্রিপিটকের মাধ্যমে । বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় শিক্ষাব্যবস্থাতেই

বিতর্ক এবং আলোচনা সভার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার যেটা ত্রুটি ছিল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা সেখান থেকে আলাদাও হয়ে গেছে এবং উন্নতির দিকে এক ধাপ এগিয়েও গেছে । ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় শূদ্ররা শিক্ষালাভ থেকে ছিল বঞ্চিত। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষায় জাতিভেদ ছিলনা , এমনকি জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রসারের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নানাভাবে চেষ্টাও করেছেন। ভারতীয় শিক্ষাধারার ইতিহাসে গণশিক্ষার প্রবর্তন বৌদ্ধদেরই অবদান । আর এই গণশিক্ষার মাধ্যম যেহেতু ছিল মাতৃভাষা তাই সেসময় আঞ্চলিক ভাষাসমূহের গুরুত্বও বেড়ে যায় । সেদিক থেকে দেখতে গেলে শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রচলন বৌদ্ধশিক্ষারই অবদান ।

উপাধ্যায় ও কর্মাচার্য – এই দুই শ্রেণীর শিক্ষকের কথা পাওয়া যায় বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায়। সারা জীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন এই দুই শ্রেণীর শিক্ষক। শিক্ষার্থীকে বিদ্যাদান ছিল উপাধ্যায়ের কর্তব্য এবং শিক্ষার্থীকে বিনয়, আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া ছিল কর্মাচার্যের কর্তব্য। উপাধ্যায় ও কর্মাচার্য কঠোর ব্রহ্মচর্য জীবন কাটাতেন এবং তাঁদের প্রয়োজনও অতীব সামান্য ছিল বলেই কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ ঘটা সহজ ছিল না । [১২]

বিপুলাকারের বৌদ্ধ সাহিত্যের ভিতরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেসময়ের সমাজে প্রচলিত শিক্ষা -দীক্ষার ইতিহাস। সূত্রপিটকের খুদ্দনিকায়ের পনেরোটি গ্রন্থের দশম গ্রন্থ জাতক। জাতকের বেশ কয়েকটি কাহিনী থেকে আমরা সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং জনসাধারণের শিক্ষা – এই দুই প্রকারের চিত্রই রয়েছে জাতকে। দরিদ্র বালকদের ভরণপোষণ এবং শিক্ষাবিধানের দায়ভার গ্রহণ করতো

সেসময়ের বারাণসীবাসী । 'লোশক' জাতকে লেখা আছে " এই সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসি নগরের একজন দেশবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন ; পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট শিল্প শিক্ষা করিত বারাণসী-বাসীদিগের মধ্যে প্রথা ছিল যে তাহাঁরা দরিদ্র বালক দিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিতেন। " [১৩] গ্রামবাসীরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতো এবং শিক্ষকদের বেতন ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও করে দিত । "গ্রামবাসীরা মিত্রবৃন্দকে শিক্ষক নিযুক্ত করার পর তাঁহার গ্রাসচ্ছাদনের জন্য বেতনের ব্যবস্থা করিল এবং বাসের জন্য গ্রামদ্বারে একখানি কুটির নির্মাণ করিয়া দিল ।" [১৪] শিক্ষার জন্য গ্রামবাসীদের এই পদক্ষেপ গ্রহণ সমাজ সচেতনতারই পরিচায়ক ।

সাধারণের জন্য প্রবর্তিত এই শিক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষারও উন্নত ব্যবস্থা ছিল । উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য বিষয় ছিল "তিন বেদ ও অষ্টাদশ শিল্প"। বারাণসী ,তক্ষশীলা প্রভৃতি জায়গায় বিখ্যাত চতুষ্পাঠী ছিল যেখানে শিক্ষার্থীরা দূর দূরান্ত থেকে পড়তে আসত । তক্ষশীলা ভারতবর্ষের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষ এবং পারস্য সীমান্তে অবস্থান এবং উন্নতমানের বিদ্যাচর্চার কারণে। পরবর্তী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন নালন্দা, বিক্রমশীলা , ওদন্তপুরী প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ কর্তৃক স্থাপিত হয় । জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়লে তৎকালীন সমাজে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পাঠ সম্পন্ন হতো না। [১৫] এরূপ কতগুলো বৌদ্ধবিহারের প্রসঙ্গ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

তক্ষশীলা

ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হল তক্ষশীলা। অনেকে মনে করেন পালি 'তক্ক' শব্দ থেকে তক্ষশীলা নামের উৎপত্তি হয়েছে । তাঁদের মতে তক্ষশীলায়

বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণ উপস্থিত থেকে তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করতেন। আবার অনেকের মতে তক জাতি যাঁরা নাগ-পূজক ছিলেন তাঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই এই শিক্ষাকেন্দ্রের এরূপ নাম। এখানে অধ্যাপনার বিষয় ছিল ত্রিবেদ এবং অষ্টাদশ বিদ্যা। দেশ-বিদেশের বহু পড়ুয়া এই শিক্ষাকেন্দ্রের উৎকর্ষে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্যালাভের অভিলাষে আসতো। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন বারাণসী , মিথিলা , ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি স্থান থেকে শিল্পবিদ্যা এবং বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য রাজপুত্রগণ, পুরোহিত ,ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্রগণ আসতো। মিশর , ব্যাবিলন , সিরিয়া , ফিনিসিয়া , চীন প্রভৃতি দেশের শিক্ষার্থীগণ বিদ্যালাভের আশায় এখানে আসতো এবং গ্রীকেরা আসতো আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য ।

মগধের রাজবৈদ্য, বুদ্ধের এবং ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসক জীবক-কৌমারভৃত্য , পাণিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

নালন্দা

ডঃ সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতানুসারে খ্রিষ্টীয় ৪৫০ অব্দে নালন্দা বিহার রাজকর্তৃক অনুমোদিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত এর গৌরব অক্ষুন্ন ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল জনপ্রিয়তার কালে বিশ্ব-বিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় মগধের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। শুধু তাই নয় , এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন বৌদ্ধবিহারগুলির নির্মাণ ও গঠনপ্রণালী প্রাচীন শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন রুপেও চিহ্নিত ছিল তৎকালে। নালন্দার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তির নিদর্শন ছিল এর গ্রন্থাগারগুলি। এখানে সংশ্লিষ্ট বিহারে আটটি বিস্তৃত কক্ষ এবং তিনশত প্রকোষ্ঠ ছিল। রত্নসাগর , রত্নোদধি এবং রত্নগঞ্জ নামে তিনটি হর্মে তিনটি সমনামের গ্রন্থাগার ছিল যার মধ্যে রত্নোদধি ছিল নবতল বিশিষ্ট গ্রন্থাগার।

প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদি ও পরবর্তী কালের আঠারো প্রকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি ছাড়াও সংস্কৃত শাস্ত্রেরও চর্চা হতো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। দশ সহস্রাধিক ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতো। চীন, জাপান , তাতার , তিব্বত , শ্যাম , আনাম , ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশসমূহ থেকে শিক্ষার্থী এখানে আসতো । এখানে অধ্যাপনার জন্য ১৫০০ জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। এঁরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই সকল অধ্যাপকের শ্রেণীবিভাগ ছিল। প্রথম শ্রেণীর দশজন অধ্যাপক পঞ্চাশ প্রকার সূত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঁচশত অধ্যাপকগণ ত্রিশপ্রকার সূত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর এক সহস্র অধ্যাপক বিংশ প্রকার সূত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। জিনমিত্র , চন্দ্রপাল , প্রভাকর মিত্র , ধর্মপাল , ভদ্রসেন , নাগার্জুন প্রমুখ অধ্যাপকগণ নালন্দার উল্লেখযোগ্য অধ্যাপকসমূহের মধ্যে ছিলেন। এঁদের মধ্যে মহামতি দিঙনাগ নালন্দার একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করে নালন্দায় অবস্থানকালে সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিক পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করে ‘ শিরোভূষণ’ উপাধি লাভ করেন। জাতিতে বাঙ্গালি প্রভাকর মিত্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তর্কশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। শীলভদ্র ছিলেন অসাধারণ দার্শনিক পণ্ডিত।

বিক্রমশিলা

পাল বংশীয় রাজা ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশিলা ছিল মগধের তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। পাল বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্রমশিলার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে চারটি তোরণ বা প্রবেশদ্বারে এক একটি প্রবেশিকা পরীক্ষাগৃহ ছিল। রাজা জয়পালের রাজত্বকালে চারটির স্থানে ছয়টি প্রবেশদ্বার নির্মিত হয় । এই প্রবেশদ্বারে নিযুক্ত থাকতেন বিখ্যাত পণ্ডিতগণ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০৮ জন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। বোধিভদ্র , কমলরক্ষিত , শ্রীধর , দীপঙ্কর –শ্রীজ্ঞান প্রমুখ অধ্যাপকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এর মধ্যে ১০৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দীপঙ্কর–শ্রীজ্ঞান ধর্মপালের রাজত্বকালে প্রধান শিক্ষাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য সমগ্র বঙ্গদেশে সুপ্রচারিত ছিল। বিক্রমশিলার বিহারাধ্যক্ষের নির্দেশে তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে প্রেরিত হন এবং খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তাতে সফলতাও লাভ করেন।

পালযুগে বঙ্গে বহু সঙ্ঘারাম প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছিল বলে প্রমাণ করেছেন শ্রীযুত নলিনীনাথ সেনগুপ্ত তাঁর "The Buddhist Viharas of Bengal" শীর্ষক সন্দর্ভে। এরূপ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠের নিদর্শন রূপে উল্লেখ করা যায় রাজা ধর্মপালের সহায়তায় নির্মিত বরেন্দ্রাঞ্চলের সোমপুরী বিহার এবং ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বিক্রমপুরী বিহারের কথা। এছাড়া ধর্মপালের রাজত্বকালেই নির্মিত হয়েছিল ত্রৈকুটক বিহার নামে অপর একটি বিদ্যাপীঠও। এগুলি ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল রামপালদেবের নির্মিত জগদ্দল মহাবিহার। এই বিহার ছিল রামপালদেবের অমর এক কীর্তি । তাঁর রাজধানী রামাবতীর বেশ কিছু অংশজুড়ে এই বিদ্যাপীঠ অবস্থিত ছিল। তন্ত্রশাস্ত্র প্রণেতা শুভাকরগুপ্ত , তর্কভাষার তিন পরিচ্ছেদের লেখক মোক্ষাকরগুপ্ত , বিভূতিচন্দ্র প্রমুখেরা এই বিহারের খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন।

তক্ষশিলা , নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি, সমাজনীতি , শিল্প , বিজ্ঞান , দর্শন এবং অন্যান্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল। শিক্ষাপ্রণালী ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

জাতকের কাহিনী থেকে জানা যায় যে বারাণসী থেকে দু হাজার যোজন দূরে তক্ষশীলা অবস্থিত ছিল । গান্ধার রাজ্যের তক্ষশীলা নগরে বোধিসত্ত্ব এক সময় বিখ্যাত আচার্য ছিলেন । তাঁর নিকটে পাঁচশো শিক্ষার্থী বিদ্যার অনুশীলন করতো ।

জাতকের কাহিনী অনুসারে শিষ্যেরা সাধারণত গুরুগৃহে বাস করতো । শিষ্যের আর্থিক অবস্থা অনুসারে গুরুগৃহে তিলতণ্ডুলতৈলবস্ত্রাদি প্রদান করা হতো । অনেক সময় শিষ্যের আত্মীয়স্বজন , অন্যান্য লোকও গুরুগৃহে তণ্ডুল , কাঠ , নানা উপকরণ দান করত । এগুলির সাহায্যেই চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্বাহ হত। [১৬] 'তিলমুষ্ঠি জাতক' কাহিনীটিকে সেসময়ের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য পরিবেশক গল্প বলা যেতে পারে । এই কাহিনীতে বারাণসী রাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমার তৎকালীন সময়ের রীতি অনুসারে ষোল বছর বয়সে পিতার আদেশে তক্ষশীলায় বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য আচার্যের সন্নিকটে উপস্থি হলে আচার্য জানতে চান "তুমি দক্ষিণা দিয়া বিদ্যা শিখিবে কিংবা গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা শিখিবে ? " [১৭] তখন সমাজে দুরকম ধারা প্রচলিত ছিল। বিত্তবানেরা শিক্ষারম্ভের শুরুতেই আচার্যভাগ বা গুরুদক্ষিণা দিত এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা গুরুকে সেবা করেই সন্তুষ্ট করত । আবার কখনো কখনো ভিক্ষা করেও শিক্ষা শেষে দরিদ্ররা গুরুদক্ষিণা প্রদানের চেষ্টা করতো। [১৮] 'তিলমুষ্ঠি জাতক'-এর কাহিনীতে এও দেখা যায় যে এই দুই প্রকার ছাত্রের পাঠের সময়েরও পার্থক্য রয়েছে । "ধর্মান্তেবাসীরা দিবাভাগে আচার্যদিগের সাংসারিক কার্য করিয়া রাত্রিকালে পাঠগ্রহণ করিত , কিন্তু যাহারা দক্ষিণা দান করিত , আচার্যরা তাহাদিগকে জ্যেষ্ঠপুত্রবৎ মনে করিয়া শিক্ষা দিতেন"। [১৯] যদিও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা শারীরিক শাস্তি বিধানের পক্ষপাতী ছিলনা তবু শিষ্যের অন্যায় আচরণে গুরুর দৈহিক শাস্তি দেবার ছবিও দেখতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধযুগে, শিক্ষা শেষ করে অনেকে খ্যাতি লাভের আশায় বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতো এবং সে স্থানের পণ্ডিতদের সাথে নানা বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হতেন । উভয় পক্ষ এরূপ স্থলে কোন একটা পণে আবদ্ধ থাকতেন । 'শ্বেতকেতু জাতক'- এ ব্রাহ্মণ বংশীয় জাত্যাভিমানী শ্বেতকেতুকে এক চণ্ডালের নিকট পরাজিত হয়ে পূর্ব শর্তানুসারে চণ্ডালের পাদদ্বয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে।[২০]

উপরিউক্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও বৌদ্ধযুগে সাধারণ জনগণের মধ্যেও একটা শিক্ষার ধারা বহমান ছিল । পুতুল নাচ, ধর্ম সম্বন্ধীয় নাটক এবং সামাজিক নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণকে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষা দান করা হতো। [২১]

২.২) আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিক্ষাজগৎ ও শিক্ষকসমাজ

" দিঢ করিও মহাসুহ পরিমাণ । লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ" - এই হল বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রামাণ্য নিদর্শন চর্যাপদে বর্ণিত আদি সিদ্ধাচার্য লুই পাদের প্রথম অনুজ্ঞা । বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন 'চর্যাপদ' –এ বৌদ্ধধর্মের গুহ্য সাধন পদ্ধতি বিধৃত হয়েছে। চর্যাগানে নানাভাবে গুরুর প্রসঙ্গ এসেছে ,এমনকি মুনিদত্তকৃত চর্যাগানের টীকা 'নির্মলগিরা' -তেও 'গুরু সম্প্রদায়াত বোদ্ধবং' শব্দগুলি ধ্রুবপদের মতো এসেছে। যদিও চর্যাগানের এই শিক্ষাপদ্ধতি কোন আনুষ্ঠানিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতি নয় এবং পদগুলিতে বর্ণিত পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণভাবেই সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকের 'চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত সহজ মহাসুখ ' লাভের গুহ্যসাধন পদ্ধতি যা একমাত্র দীক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্যই নির্দেশিত , তবু গুরুর গৌরবীকৃত বারংবার উল্লেখ ও

মহাশূণ্যতার অনুভূতির প্রসঙ্গ কোথাও যেন প্রাচীন ভারতীয় গুরুমুখী মৌখিক শিক্ষাধারার ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মধ্যযুগ নামে চিহ্নিত সময়কালটিতে সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল অনুপ্রবেশকারী ইসলাম ধর্মী মুসলিম সুলতানরা । ভারতে প্রথম মুসলিম অভিযান শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীতে । গজনীর সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পর থেকে মুসলিম বিজয় অভিযান শুরু হয় । সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের একশো বছর যেতে না যেতেই মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের গোড়াপত্তন হয় । মুসলিম বিজয়ের পর ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয় । নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলেও এবং সুদীর্ঘকাল মুসলিম শাসনাধীন থেকে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ব গৌরবের আসন থেকে বিচ্যুত হলেও হিন্দুসমাজ তাঁর দেশীয় নিজস্ব শিক্ষাধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এর পাশাপাশি মুসলমান শাসক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে তোলা মুসলিম সমাজেও তাঁর নিজস্ব শিক্ষাধারাকে বহমান রেখেছিল । ভারতে বিজয়ী মুসলিমরা বিজিত রাজ্যের মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে । মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম শিক্ষার প্রসার ঘটেছে । মুসলিম শিক্ষাও ছিল প্রাচীন অন্যান্য শিক্ষার মতন ধর্মকেন্দ্রিক। ভারতে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবকের সময় থেকেই । অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসতে শুরু করে প্রথমে উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বিজয়ী মুসলিমগন যার প্রভাব পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারতেও। এরপর দ্বাদশ -ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর– পূর্ব ভারতের একটি বিশেষ অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল তারা । ভারতবর্ষের এই

রাজনৈতিক পালাবদল প্রভুত ক্ষতি করেছিল প্রচলিত সমাজ , রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনকে । এরকম বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থাও । এরূপ পরিস্থিতিতে মুঘল শাসনকালে কোন কোন মুঘল সম্রাট শিক্ষা বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । তাঁরা মসজিদে , মঠে এবং পণ্ডিতদের অর্থদান করে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । হুমায়ূন দিল্লীতে একটি মাদ্রাসাও স্থাপন করেছিলেন । আকবরের রাজত্বকালে স্কুল ও কলেজের শিক্ষাপদ্ধতিতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি ফতেপুর সিক্রী , আগ্রা এবং অন্যান্য স্থানে কলেজও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । জাহাঙ্গীর এবং শাহাজানও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছিলেন ।[২২]

মুঘল শাসনকালে বঙ্গদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক বিরাট পরিবর্তন আসে । রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে "প্রাচীন হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলাদেশের কোন একটি বিশেষ নাম ছিল না । ইহার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল... মুসলমান যুগে সর্ব প্রথম এই সমুদয় দেশ একত্রে বাংলা বা বাঙ্গালা এই নামে পরিচিত হয় । " মুঘল সুবাদার ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন ... তাঁরা বঙ্গে মুসলিম সভ্যতা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন । মুসলমানদের ধর্মীয় উন্নতির জন্য মুসলিম শাসকগণ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন । বঙ্গদেশের সুবাদার ঢাকাতে একটি বিরাট মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসা লালবাগের শাহী মসজিদে বসত। শিক্ষকদের বেতনসহ মাদ্রাসার খরচ সুবাদারের তহবিল হতে দেওয়া হতো । [২৩]

ঐতিহাসিকদের মতে সতেরো শতক নাগাদ মুঘল আমলে বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন , ধানচালের কারবার , বস্ত্রশিল্পের এবং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি কারণে বাংলার অর্থনীতি গতিশীল হয়ে পড়ে । সতেরো শতকের মুদ্রা অর্থনীতির প্রসারের কারণে

হিসেবের জটিলতা এবং অঙ্ক শেখার প্রয়োজন বেড়ে যায়। সেকারণেই সতেরো শতকে বাংলা পাঠশালার প্রচলন বেড়ে যায়। বাংলা পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধির অপর একটি কারণ হল নথিপত্র লিখতে শেখার প্রয়োজনীয়তা। কারণ, মুঘল আমলেই জমির পাট্টা , দলিল – দস্তাবেজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ব্যবহারিক শিক্ষার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হতো বাংলা পাঠশালার এই স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায়। [২৪] মুসলমান অধিকারের পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মতো বাংলায় ধর্মান্তরিতদের ইসলামি আচরণ শেখানোর জন্য মকতব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল । ধর্মান্তরিত মুসলমানদের জন্যই বাংলার গ্রামে গঞ্জে বহু মসজিদ স্থাপিত হতে থাকে । এই মসজিদগুলিকে কেন্দ্র করেই প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র মকতব , মাদ্রাসা তৈরী হতে থাকে। [২৫] মুঘল আমলে বাংলায় যে মসজিদের একতলায় মকতব থাকত এবং দোতলায় মসজিদ থাকত তার উল্লেখ আব্দুল করিম তাঁর গ্রন্থে করেছেন ।

আদি – মধ্যযুগের প্রথম বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের“ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-”এ সামাজিক বিবরণ প্রসঙ্গে শিক্ষার বিবরণ দেখতে পাওয়া না গেলেও পরবর্তীকালের সাহিত্যে মধ্যযুগের শিক্ষাপদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

সাহিত্যের সুনির্দিষ্ট যুগবিভাজন সম্ভব নয়। সাহিত্য বিশ্লেষণের সুবিধার্থে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এ যুগ বিভাজন করা হয়ে থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি অনুযায়ী দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে যে সকল সাহিত্য রচিত হয়েছে সেগুলিকে মধ্যযুগের সাহিত্য বলা হয়ে থাকে । এর মধ্যে ১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়কাল বাংলার ইতিহাসে অন্ধকার যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এই সময় বাংলায় সাহিত্য রচিত হলেও তুর্কী আক্রমণের প্রাবল্যে , তাদের প্রভাবে সে সাহিত্যের অস্তিত্ব মেলেনি। মধ্যযুগে

বাংলা ভাষায় যে সাহিত্য সমূহ সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি সবই ছিল পয়ার ছন্দে রচিত এবং বেশীরভাগই ছিল দেবদেবী কেন্দ্রীক ভক্তিমূলক ধর্মীয় রচনা। এই সাহিত্যের মধ্যে ছিল মূলত বৈষ্ণব সাহিত্য , চৈতন্যজীবনীকাব্য , মঙ্গলকাব্য , অনুবাদ সাহিত্য , লৌকিক প্রণয় কাব্য ,নাথ সাহিত্য , লোক সাহিত্য ইত্যাদি। এই সকল কাব্যে কৃষ্ণ , রামচন্দ্র , জনমেজয় , চৈতন্যদেব প্রমুখদের বিদ্যালাভ এবং বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলির নায়ক চরিত্রদের শিক্ষালাভের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার থেকে সে যুগের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা গড়ে নেওয়া যায়। মধ্যযুগের কাব্যসমূহে হিন্দু এবং মুসলিম দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

মধ্যযুগের অন্যতম পুরোধা পুরুষ চৈতন্য দেবকে কেন্দ্র করে সন্তজীবনী কেন্দ্রিক যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা থেকে সেযুগের সমাজ সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ ছিল উন্নত শিক্ষা - সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান যেখানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পড়তে আসতো ঠিক যেমন একসময় আসতো তক্ষশীলা, নালন্দায় । নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। /নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।।[২৬] ষোড়শ শতাব্দীর জনপ্রিয় উন্নত ন্যায়শাস্ত্র চর্চার ধারা পরবর্তী শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । এই উন্নত অবস্থান ছিল একশ্রেণীর হাতে । কিন্তু, অন্যশ্রেণীর অবস্থান ছিল তথৈবচ।

চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায় নবদ্বীপের বিদ্যাশক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জগন্নাথ মিশ্র বিদ্যার্জনের নিমিত্তে এখানে এসেছিলেন । কিন্তু নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করার পরেও তাঁর অভাব ছিল চিরসঙ্গী “কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষ সকল । সবারে পোষায়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ববল ।।/ সাক্ষাতেই কেন না দেখ আমাত । পড়িয়াও আমার ঘরেতে নাহি ভাত ।।”[২৭] এতদসত্ত্বেও , স্ত্রীর অনুরোধ- উপরোধেও জগন্নাথ মিশ্র ব্রাহ্মণ সমাজ নির্মিত জাতিগত

কৌলিক বৃত্তি পরিত্যাগ করতে পারেননি । অর্থাৎ, সেসময়েও সমাজে জন্মগত কৌলিক বৃত্তিরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বিদ্যা – বৈদগ্ধ্য –জ্ঞান সবই যে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে অন্নচিন্তার কাছে , সাংসারিক অস্বচ্ছলতার কাছে তা যুগসন্ধির কবি ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ থেকেই জানা যায়। সংস্কৃত কাব্য , ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গমতা লাভ করার পরেও বাধ্য হয়েই কবিকে অন্ন সংস্থানের তাগিদেই গৃহ পরিত্যাগ করে অর্থকরী বিদ্যা ফারসি শিখতে হয় । হিন্দুসমাজে ফারসির প্রচলন জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল সপ্তদশ শতক থেকেই । বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে সাথে শিক্ষাতেও পরিবর্তন আসে। মুঘল আমলে হিন্দুসমাজে ফারসি ভাষা অর্থকরী এবং রাজভাষা বলে স্বীকৃতি লাভ করে । ফৌজদারি – দেওয়ানি আদালত এবং ঢাকা মুর্শিদাবাদে সুবাদার ও দেওয়ান বিভাগে ফারসি ভাষার প্রচলন ছিল । রাজস্ব বিভাগে একচেটিয়া অধিকার ছিল ফারসি জ্ঞানসম্পন্ন উর্দুভাষী মুঘল সুবাদারদের বা রাজকর্মচারীদের । এই কর্মচারীদের মধ্যে অনেক হিন্দুও ছিল । সুবাদারদের রাজত্বে পুরনো জমিদার বংশ উচ্চ হারে রাজস্ব না দিতে পারায় সুবাদারীর কাজে নিযুক্ত অর্থবান , কৌলিন্যহীন কর্মচারীরা কিনে নিতে থাকে সেসব বিষয়সম্পত্তি । এরাই প্রভূত সম্পদের মালিক হতে থাকে । এই নবসৃষ্ট জমিদারেরা টোল – চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে প্রদত্ত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি বা গুরু –পুরোহিতের জন্য প্রদত্ত ‘বার্ষিকে’ র বন্দোবস্ত বন্ধ করে দেয় । তার ফলে শিক্ষার অবনমন অবধারিত হয়ে পড়ে । খুব স্বাভাবিক ভাবেই “রাষ্ট্র যেখানে প্রতিকূল অথবা উদাসীন, হিন্দুর প্রতি শাসকশক্তি বিরূপ এবং সামন্ত- ভূস্বামী শক্তি যেখানে ‘অস্তংগতমহিমা ’, সেখানে মৌলিক শিক্ষাদর্শ তো অবনত হইয়া পড়িবেই ।[২৮]

অনূদিত রামায়ণ , মহাভারত , ভাগবতের রামচন্দ্র , জনমেজয় এবং কৃষ্ণের যে বিদ্যালাভের চিত্র আছে তা মূলত সেকালের সংস্কৃত শিক্ষার ধারাতেই অঙ্কিত হয়েছে। এ সকল চরিত্র প্রায় সকলেই অবতার বা উচ্চবর্ণের অন্তর্গত। কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্রের বিদ্যারম্ভ হয়েছে পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ির মধ্যে দিয়ে। বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবতে "হাতেখড়ি এবং লেখাপড়া শেখার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বৃন্দাবনদাস

"শুভদিনে শুভক্ষনে মিশ্র পুরন্দর ।
হাতেখড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর ।
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
করিলেন শ্রীচূড়াকরণ ।।

...

সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদের পঠনীয় বিষয়ের পাশাপাশি এই যুগের সাহিত্যে অব্রাহ্মণদের সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়সূচি কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায় মনসামঙ্গলের লখিন্দর , চণ্ডীমঙ্গলের শ্রীমন্ত শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যমে। আবার এই মধ্যযুগেই শিক্ষার ইতিহাসে যুক্ত হয় এবং ক্রমশ প্রাধান্যও বিস্তার করতে থাকে বাংলা রীতিতে, বাংলা মাধ্যমে গড়ে ওঠা ব্রাহ্মণেতর হিন্দুদের পাঠশালা। এই ঘটনার ছাপ সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যেও পড়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যে লখিন্দরের শিক্ষালাভের প্রসঙ্গটি যদিও সংস্কৃত শিক্ষার ধারাতেই কবিগণ বিবৃত করেছেন কিন্তু লক্ষণীয় যে লখিন্দর উচ্চবর্ণের চরিত্র নয় , সে 'বানিয়ার নন্দন'। বনিক চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরের হাতেখড়ি হয় – "পঞ্চ বৎসরের যদি লখিন্দর হইল।/ হাতেখড়ি কর্ণভেদ এক কালেতে কইল।।" সোমাই পণ্ডিতের নিকটে

লখিন্দরের বিদ্যারম্ভানুষ্ঠানের এ তথ্য পাওয়া যায় পনেরো শতকের কবি বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণে’। তাই যেখানে কৃত্তিবাসী ‘রামায়ণে’ রামের বিদ্যা শিক্ষায় “ ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি । / অবশেষে পড়িলে রাম চতুঃশ্রুতি।।” –র কথা আছে সেখানে দেখা যায় মনসামঙ্গল কাব্যে বনিক পুত্রের বেদ, বেদান্ত , স্মৃতি পাঠ অনুল্লিখিত। লখিন্দরের শিক্ষণীয় বিষয়ের বর্ণনায় তৎকালীন অব্রাহ্মণের সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়সূচীতে কি কি পঠিতব্য ছিল তার বিষদ উল্লেখ রয়েছে। [২৯]

‘মনসামঙ্গল’-এর অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মুসলমানদের শিক্ষার বিবরণ। সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে যখন রাজত্ব করছিল মুসলিম সম্রাটগণ তখন বাংলায় রচিত সাহিত্যে তা সে হিন্দু কিংবা অ-হিন্দু কবি কারো রচনাতেই সেরূপভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের লেখাপড়ার বিবরণ প্রায় পাওয়াই যায়না। মুসলিম লেখাপড়ার বিবরণ অল্প-বিস্তর মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়। বিপ্রদাস পিপলাই এর ‘মনসাবিজয়ে’ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার উল্লেখ দেখা যায়-

“জতেক ছৈয়দ মোল্লা   জপয়ে ত বিসমিল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।
হিন্দুত কলিমা দিল   মুছলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুছলমান ।।
শিখাএ নামাজ অজু   সদাই মক্তবে রুজু
নিরন্তর খলিপা জোগান।”

দ্বিজ মাধবের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যেও গুজরাট নগরে নানা জাতির বিবরণ দিতে গিয়ে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন –

“বৈসয়ে মুসলমান   পড়ে কিতাপ কোরান

নমায়াজ পড়্হে পাঁচবার

সোলেমানী মালা করে   খোদার নামে জিগির

কাঢ়ে সৈদ কাজী বোসিল অপার।"

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও শ্রীমন্তের শিক্ষা প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার আদলেই । অথচ ব্যাধ পুত্রের শৈশব এঁকেছেন অন্যরূপে । "গনকে আনিয়া ঘরে/ শুভদিনে শুভবারে/ ধনু দিল ব্যাধসুত – করে।" এ বর্ণনা দিয়েছেন মুকুন্দরাম কালকেতুর শৈশবের প্রসঙ্গে। লক্ষণীয় কালকেতু ব্যাধ পুত্র বলে তার বিদ্যাশিক্ষার কথা নেই বরং শুভদিনে হাতে ধনু দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । সে সময়ের সমাজে নিম্নবর্ণের ব্যাধ পুত্র শিক্ষাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। অর্থাৎ, এ ঘটনা শিক্ষায় বর্ণভেদের প্রসঙ্গটিকেই নির্দেশিত করছে । [৩০]

ঘনারামের ধর্মমঙ্গল- এ লাওসেন 'জ্ঞান ধর্ম বিদ্যা' শিক্ষা লাভ করেছে , তাও প্রাচীন বৈদিক শিক্ষারই অনুসরণে ।

মধ্যযুগে প্রথম শিক্ষাগুরুর জীবন অবলম্বনে সাহিত্য রচিত হতে দেখা যায়। শ্রীখণ্ডে বৈদ্যবংশে জাত বলরাম দাসের শিক্ষাগুরু ছিলেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র । দীক্ষাগুরু জাহ্নবীদেবী বলরাম দাসের নবনামকরন করেন নিত্যানন্দ দাস নামে । বৈষ্ণব সমাজের খুঁটিনাটি তথ্য সমৃদ্ধ 'প্রেমবিলাস' রচনা করার পূর্বে নিজ শিক্ষাগুরু বীরচন্দ্রের চরিত্র অবলম্বনে জীবনীকাব্য লিখেছিলেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর রচিত 'প্রেমবিলাস'-এ এরূপ ইঙ্গিত থাকলেও এ গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না । [৩১]

অষ্টাদশ শতকের পূর্বের শিক্ষা পদ্ধতি আলোচনায় দেখা গেল ব্রাহ্মণ শ্রেণীর জন্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যপন্থী সংস্কৃত শিক্ষাই প্রচলিত ছিল সমাজে এবং ব্রাহ্মণেতর হিন্দুরাও সেই শিক্ষাই লাভ করতো কিছু বিষয় বাদ দিয়ে। এসব ছাড়াও হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রাথমিক দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা। বাঙালী হিন্দু সমাজ পরিচিত হয়েছে মক্তব-মাদ্রাসার সঙ্গে। শুধু তাই নয় অন্নসস্থানের জন্য সংস্কৃতের পাশাপাশি ফারসি ভাষা শিক্ষাকে আত্মীকরণও করতে হয়েছিলো সমসাময়িক শিক্ষার্থীদের।

উৎস ও তথ্য নির্দেশ

১) ঘোষ. অরুণ, 'শিক্ষার ভাবধারা , পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস' , পৃ-৯

২) শাস্ত্রী. গোপাল চন্দ্র, 'উপনিষদ কথামৃত', ১৯৭৯, পৃ-১২১

৩) ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদবাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ । / ঊরু তদস্য জদবৈশ্যঃ পড্যান শূদ্রো অজায়ত ।। (১০/৯০/১২) পৃ-৫৭০ খণ্ড ২ ঋগ্বেদের পুরুষ সুক্ত থেকে বোঝা যায় হিন্দুধর্মে চারটি বর্ণ তখন থেকেই জন্ম নিয়েছিল । যদিও এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন অনেকে । আল-আমিন. আব্দুল(সম্পাঃ), 'ঋগ্বেদ সংহিতা' , খণ্ড ২, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ-৫৭০

৪) তদেব, খণ্ড ২, পৃ-৫৭০

৫) মুখোপাধ্যায়. উপেন্দ্রনাথ (সম্পাঃ), 'মনু সংহিতা', বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩০৪, পৃ-১০২

৬) তদেব, পৃ-১২৫

৭) তদেব, পৃ-১১৮

৮) চাকী. জ্যোতিভূষণ (সম্পাঃ) , 'কালিদাস সমগ্র' , নবপত্র প্রকাশন , ১৯৮২ ,পৃ - ২৩৯

৯) মুখোপাধ্যায়. উপেন্দ্রনাথ (সম্পাঃ), 'মনু সংহিতা', বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা , ১৩০৪, পৃ-১২২

১০) তদেব,পৃ-১৪৬

১১) তদেব,পৃ-১৪৬

১২) ঘোষ. অরুণ, 'শিক্ষার ভাবধারা - পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস', পৃ-৩৭

১৩) ঘোষ. ঈশানচন্দ্র (অনূদিত), 'লোশক জাতক ; জাতক , প্রথম খণ্ড ', করুণা প্রকাশনী , কলকাতা , ১৩৮৪,পৃ -৯৪

১৪) তদেব, পৃ -৯৪

১৫) বড়ুয়া. শ্রীধরচন্দ্র , 'প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ' , মহাবোধি সোসাইটি , কলিকাতা, পৃ -৮১

১৬) ঘোষ. ঈশানচন্দ্র (অনূদিত), 'লোশক জাতক ; জাতক , প্রথম খণ্ড ', করুণা প্রকাশনী , কলকাতা , ১৩৮৪, দ্রঃ ভূমিকা অংশ

১৭) তদেব , পৃ -১৭৫

১৮) তদেব , পৃ -২০১

১৯) তদেব , পৃ -১৭৫

২০) তদেব , পৃ -৩৭৭

২১) বড়ুয়া. শ্রীধর, 'প্রাচীন বৌদ্ধবিহার', পৃ -৮৩

২২) জওহর. মোবারক করিম , 'ভারতে মুসলিম সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ – ১ম খণ্ড', স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স , কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃ -১৩১

২৩) তদেব , পৃ -২৩

২৪) আচার্য. পরমেশ , 'বাংলার দেশজ শিক্ষা' , অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা ,২০০৯, পৃ-৯৮

২৫) তদেব , পৃ- ১২২

২৬) দাস. বৃন্দাবন, 'শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত', গৌরাঙ্গ প্রেস, কলকাতা , ৪৪০ গৌরাব্দ পৃ-১১

২৭) তদেব

২৮) বন্দ্যোপাধ্যায়. অসিত , 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- তৃতীয় খণ্ড', ১ম পর্ব ,পৃ-২৮

২৯) আচার্য. পরমেশ , 'বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা' , অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা ,২০০৯, পৃ- ৬৫

৩০) তদেব, পৃ- ৭০

৩১) বন্দ্যোপাধ্যায়. অসিত , 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- তৃতীয় খণ্ড', ১ম পর্ব ,পৃ - ৪২৯

৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঊনবিংশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্যে শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষক সমাজ

১

বহুমাত্রিক পরিবর্তনের সাক্ষী উনিশ শতকে সবথেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সম্ভবত সমাজের দিকে। উনিশ শতকীয় পরিবর্তনের হাওয়ায় সমাজ জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত শিক্ষার ধারাতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। এই শতকে বাঙালি সমাজ পরিচিত হয় পাঠশালার পরিবর্তে স্কুল নামটির সঙ্গে । গুরুমশাই রূপান্তরিত হলেন টিচার বা মাস্টারমশাই -এ । বাঙালির হাতে এলো পুঁথির পরিবর্তে টেক্সট বুক। জমিদারের সিধা পরিণত হল মাসিক বেতন কাঠামোয়। অর্থাৎ শিক্ষার বিষয়, প্রক্রিয়া , মাধ্যম , কাঠামো সবেতেই এসেছিল পরিবর্তন । কখনো সমষ্টিগতভাবে দেশীয় উদ্যোগে , কখনো মিশনারিদের দ্বারা , কখনো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় , আবার কখনো বা বিদেশী রাজশক্তির সহায়তায় এ শতকের প্রথমার্ধে এবং প্রায় সমগ্র শতকটি জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । শুধু তাই নয় , সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন নিয়ে সমগ্র শতকটি জুড়ে বিদেশী ও স্বদেশী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে বহু বাদ প্রতিবাদও চলেছে । মিশনারী এবং ইংরেজদের আগমনে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে বাঙালি সমাজে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাটি যে উদ্যম ও স্ফীত হয়েছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই ঠিকই কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক , রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক বহু বিপর্যয়ে বিধস্ত বাংলাদেশও যে তার দেশজ শিক্ষার ধারাটি বহমান রাখতে সক্ষম হয়েছিল সেই বিষয়টিও কম বিস্ময়ের উদ্রেক করেনা ।

২

ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের(১৮৮৩) প্রতিবেদন অনুযায়ী "দেশজ শিক্ষালয় বলতে বোঝায় সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলি দেশীয় লোকেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইসব শিক্ষালয়গুলি হয় শুধু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না হয় একেবারেই প্রাথমিক শিক্ষালয়।"[১] শিক্ষকই ছিলেন এই দেশজ শিক্ষার মূল খুঁটি ।[২] একক গুরুমশাই বিশিষ্ট দেশীয় পাঠশালাতে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর মানুষ পঠন পাঠনের সুযোগ পেলেও অন্ত্যজ বর্ণের হিন্দুই বেশি পড়তো । গুরুমশাইও সাধারণত হিন্দু বর্ণের নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হতেন।[৩] বারোয়ারিতলা , চণ্ডীমণ্ডপ ,ধনীর বৈঠকখানা কিংবা শিক্ষকের গৃহকোণে বসা এই পাঠশালাতে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল বাংলা লেখা , পড়া, অঙ্ক, পত্রলিখন, ব্যাবসা বাণিজ্য , জমি জমার হিসেব নিকেশ এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারিক ও কারিগরি বিষয় । পড়া ও পড়ানো চলত মুখে মুখে , আর লেখা চলত তালপাতায়। কিন্তু এহেন মামুলি শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও শূন্যগর্ভতা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য যে ব্যবস্থাটা ছিল অনেকটা সর্বজনীন অর্থাৎ দেশের সব অঞ্চলে নিরাভরণ ও নিরোপকরণ পাঠশালাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল সহজ প্রবেশ্য ও সে যুগের মানুষের আটপৌঢ়ে প্রয়োজন মেটানোর সহায়ক । অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম ছিল হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য টোল , চতুষ্পাঠী । মুসলমানদের তেমন ছিল মক্তব এবং মাদ্রাসা । অতুল সুর তাঁর 'শিক্ষা ও পণ্ডিত সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দুদের এই পাঠশালা এবং চতুস্পাঠীর পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন "পাঠশালা যে কোন জাতির লোক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারতেন , কিন্তু চতুস্পাঠীসমূহ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণই পরিচালনা করতেন।"[৪] তৎকালীন পাঠশালাগুলিতে শিক্ষা অর্জন করা ব্যক্তিকে রীতিমত শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য বলে গণ্য করা হতো, এমনকি নিজ পরিবারের মধ্যেও বিশেষ মর্যাদা লাভ করতো সে।[৫] কিন্তু অষ্টাদশীয়

সর্বজনীন সহজ প্রবেশ্য প্রয়োজনীয় এই প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি এবং উচ্চতর টোল চতুস্পাঠীর শিক্ষা পদ্ধতিও উনিশ শতকে ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে পড়ে । এমন কি উনিশ শতকের শেষ দিকে তার একেবারে অবলুপ্তি ঘটতে থাকে। এডামের রিপোর্ট অনুযায়ী নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অব্যাহত ছিল এবং প্রতি ৪০০ লোকের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল । অন্যদিকে, লর্ড মিন্টোর বিবরণে পাওয়া যায়, শিক্ষার প্রসার হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যাও কমতে থাকে । এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কয়েকটি বিষয় চোখে পড়ে। বাংলায় রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জমিদারি আনুকূল্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। বঙ্গদেশের বেদ-বেদান্ত , ন্যায় , স্মৃতি, তন্ত্র , কাব্য এবং যাবতীয় পুরাণ শাস্ত্রের অনন্য সাধারণ সনাতনী পন্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু সংস্কৃত চর্চার উদার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে ব্যাকরণের কচকচিতে পরিণত করে । জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ৮৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি অম্লান ছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণদেব তাঁকে একবার বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে এতে তাঁর বংশধরেরা বিলাসী হয়ে পড়বে এবং বিদ্যাচর্চা বন্ধ করে দেবে।[৬]এই সময়েও বৈদিক যুগের 'প্লেন লিভিং এন্ড হাই থিঙ্কিং' আদর্শই কাজ করেছে । " Our Third cause of the slow advantage of primary education was the neglect of indigenous schools . Great results could easily have been obtained of all the funds that government and local body allotted to primary education have been spent in developing indigenous schools. Instead of that, the indigenous

schools were allowed to die and the new system of schools was created to take their place."

৩

মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের আদি পর্বের সূচনা ঘটে। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে যে সকল বিদেশী বণিক বাংলায় এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং বাঙালী সমাজের ওপর প্রভাব ফেলেছিল পর্তুগীজরা তাদের মধ্যে প্রথম । এরা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে .প্রথম এদেশে পদার্পণ করে। বিদেশী বণিকদের সাথে সাথে ধর্মযাজকরাও ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাবার পর পর্তুগীজ বণিকরা আকবরকে তুষ্ট করে হুগলী তে ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং ধর্ম প্রচার করতে থাকে। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসা বণিকদের অনেককেই এদেশে বসবাস করতে হয় দীর্ঘকাল । তাই তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনে শুরু হল স্কুল খোলা । অন্যদিকে খৃষ্টীয় ধর্মযাজকরা শিক্ষা বিস্তার শুরু করলেন ধর্ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে ।[৭] সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে পর্তুগীজ বণিকদের অবনতি শুরু হয় এবং সেই স্থান দখল করে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে ওলন্দাজরা । পর্তুগীজ বণিকদের শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ মিশনারিদের কার্যকলাপ ও বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। অবশ্য তাদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেলেও এদেশীয় খ্রিষ্টানদের সহায়তায় তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বহুদিন পর্যন্ত চালু ছিল । এরপর ভারতবর্ষে শুরু হয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যাত্রা । দিনেমার মিশনারীগণ এদেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের সহায়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথম দিকে

ভাষাগত বাধা দূরীভূত করার স্বার্থেই কোম্পানি অর্থ সাহায্য করত ইংরাজি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করার ক্ষেত্রে। পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত মিশনারিদের সাথে ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপের ক্ষেত্রে মতবিরোধ ছিল না। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় মিশনারিদের কার্যকলাপে ক্রমশ অসহযোগিতা শুরু হয় ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে। ১৭৫৭ এর মুসলমান শাসনের পরাজয়ের পর থেকে ভারতবর্ষে চলে ইংরেজদের শাসন ও শোষণ লীলা। ধর্মীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে হিন্দু মুসলিম অধ্যুষিত বাংলায় খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে তৎকালীন মিশনারীগণ বাংলায় পদার্পন করেন এবং তারাও শিক্ষাকেই বাহন করে তাদের উদ্দেশ্যকে সফল করতে। আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে কেরি , মার্শমান ও ওয়ার্ড এই তিন ইউরোপীয় ধর্ম প্রচারক খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন শ্রীরামপুর মিশন যেখানে অনূদিত বাইবেল পাঠ করানো হত। শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পৃথক হলেও সাদৃশ্য ছিল শিক্ষাদানের মাধ্যমটিতে। দুই জায়গাতেই বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হত । এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতু বন্ধনের মতো কাজ করেছিলেন উইলিয়াম কেরি । কেরি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের মাসিক বেতনভুক শিক্ষক ।

মিশনারীরা মূলত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য স্কুল পরিচালনা করে থাকলেও ক্রমশ ধর্মপ্রচার গৌণ হয়ে পড়ে এবং এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার মুখ্য হয়ে ওঠে । কিন্তু ব্রিটিশ অধ্যুষিত ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসক প্রথম থেকেই শিক্ষাকে ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে। ব্রিটিশ সরকার এই শতকের প্রথমার্ধের শেষের দিকেও কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি ।

দেশীয়, মিশনারী , ব্রিটিশ এই তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা সমন্বিত উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষা পদ্ধতির কয়েকটি কালপর্ব পরিলক্ষিত হয় । প্রাচ্য না পাশ্চাত্য কোন মাধ্যমে ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার ঘটানো হবে এই মতানৈক্যই ছিল এই সময়কালীন শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান একটি বিচার্য প্রসঙ্গ। প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতবর্গ সাংস্কৃতিক অমূল্য সম্পদের চর্চা হওয়া উচিৎ বলে মনে করলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যবাদীরা মনে করলেন পাশ্চাত্য শিক্ষাই ভারতীয়দের অজ্ঞানতা দূর করবে । ১৮১৩ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ- এই সময় পর্বের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় প্রাচীন বিদ্যার উৎকর্ষসাধন করে এদেশীয়দের জ্ঞানোন্নতি সাধন করা । ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষায় সরকারি উদ্যোগের সূচনা হয়। এই উদ্যোগ অবশ্য দুই মতের ঐক্য ঘটাতে পারেনি বরং মতানৈক্য ক্রমশ বর্ধিত হয়েছে। অবশেষে এই অবস্থার মীমাংসা ঘটে বেন্টিঙ্কের সুপারিশে মেকলের মিনিটের মধ্যে দিয়ে । ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২ রা ফেব্রুয়ারি মেকলে তাঁর মিনিটে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদান করা হবে এবং এই সুযোগ সীমাবদ্ধ থাকবে শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। উচ্চশ্রেণীর থেকে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা চুঁইয়ে পড়বে । এটাই পরিচিত হয় ‘Downward filtration theory ‘ হিসেবে । এই কারণে পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৪ খৃ পর্যন্ত সময়কালে আবার প্রাচ্য শিক্ষার পরিবর্তে সরকারি অর্থব্যয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর একটা প্রচেষ্টা চলছিল । কিন্তু এই দুই পর্বেই জনসাধারণের শিক্ষা প্রসঙ্গটি উপেক্ষিত রয়ে গেছিল। এরপরের পর্যায়ে ১৮৫৪ এর পর থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত সময়কালে এসে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষাবিধানের নীতি অনুসৃত হতে দেখা যায় সরকারের তরফ থেকে।

বিদেশী রাজশক্তি কায়েম হবার পর রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক দিকেও পরিবর্তন আসে । এর সঙ্গে পরিবর্তন হতে থাকে দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থার। কোম্পানির প্রথম পর্যায়ের শাসনকালে কোম্পানি কর্তৃক শিক্ষা বিস্তারের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় 'উদার নিরপেক্ষ নীতির' মতাদর্শ দেখিয়ে। আইনজ্ঞ মৌলবির অভাব দূরীভূত করার জন্য এবং রাজ্যভ্রষ্ট মুসলমান সমাজকে প্রীত করার জন্য ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস স্থাপন করেন কলিকাতা মাদ্রাসা। প্রাচীন মৌলবির দ্বারা এখানে আরবি ও ফারসি রীতি অনুসরণে শিক্ষা প্রদান করা হতো। এর কিছু পরে ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, কাশিতে জোনাথন ডানকানের প্রযত্নে স্থাপিত হয়েছিল সংস্কৃত কলেজ। এই কলেজের নিয়মাবলীর মধ্যে নির্দিষ্ট হয় যে পঠনীয় বিষয় হবে মনু প্রণীত ধর্মশাস্ত্র এবং অধ্যাপকগণ হবেন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর । শুধুমাত্র বৈদ্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল । রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন ,"তদানীন্তন রাজপুরুষগণ হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি হস্তার্পন করিতে অতীব কুণ্ঠিত ছিলেন বরং সেই সকল রীতিনীতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেন ।" এই আপাত কুণ্ঠা এবং শ্রদ্ধার আড়ালেই সুপ্ত ছিল কোম্পানির সাম্রাজ্য স্থায়ীভাবে বিস্তারের কূটনীতিক উদ্দেশ্য যা উনিশ শতকের একেবারে সূচনা লগ্নে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষন পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠলো । ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নবাগত সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার নিমিত্ত লর্ড ওয়েলেসলি এই কলেজটি স্থাপন করেন । কাশির সংস্কৃত টোল কিংবা কলিকাতার মাদ্রাসা দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী থেকে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে আঠারো শতকের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়েও পাশ্চাত্য ভাবধারার বাহকগণ ধর্ম অনুশাসিত দেশের শিক্ষাক্ষেত্রকে পুরোপুরি

ধর্মীয় অনুশাসনমুক্ত করতে পারেননি । সরকারি শিক্ষানীতি পুরোপুরি ধর্ম নিরপেক্ষ রূপে পরিণত হয় সিপাহী বিদ্রোহের পর । কারণ , তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতের মাটিতে শক্ত ঘাঁটি গাড়া । তাই দেশীয় শিক্ষিত উচ্চ বর্গকে উত্যক্ত করতে চায়নি তারা । এই সকল শিক্ষোদ্যোগ উদ্দেশ্য প্রনোদিত ঠিকই কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে এইসব প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফলেই পুরাতন জীর্ণ খোলসের পরিবর্তে একটা নুতন ও প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল এদেশে ।

এই সময়ে নবগঠিত নগরী কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে ইংরেজি শেখার একটা প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছিল । এবং সেই কারণে কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছিল । সাউথ সুবার্বান স্কুলটি তার নিদর্শন। অবশ্য উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটার পূর্বেও ইংরেজি শেখার একটা প্রবণতা অনবরত চলছিল বাংলায় । এর সূত্রপাত ঘটেছিলো ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের পর থেকেই । এই সময়ে দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ জন্মানোর কারণ অর্থ উপার্জনের সহায়ককারী ভাষা ছিল ইংরাজি এবং সামান্য কিছু ইংরাজি শব্দার্থ জানা থাকলেই লোকে অনায়াসে চাকরি করতে পারত। [৮] অর্থাৎ, ব্যাবসার আদান প্রদানের জন্যে এই ভাষা শেখার চেষ্টা লাভজনক ছিল। এই পর্বের ইংরাজি শিক্ষার শিক্ষক সম্প্রদায় কিন্তু কেউই যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না । [৯] এসময়ের ইংরেজি শিক্ষার নমুনা শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ’ গ্রন্থে পাওয়া হয়। এরপর ১৮১৩ র চার্টার্ড অ্যাক্ট বা সমতা আইন ,১৮১৬ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রদত্ত গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস এর বক্তৃতা, রামমোহনের উদারনৈতিক চিন্তাধারা , মানবদরদি হেয়ারের সদিচ্ছা বাংলার শিক্ষাধারায় একটা নতুন দিক উন্মোচন করে দেয়। ভারতীয় প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সাহায্যে শিক্ষার প্রসার এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ভারতীয় প্রথম প্রচেষ্টা

খুব সীমাবদ্ধভাবে শুরু হলেও পরবর্তীকালে ব্যাপকাকারে বেসরকারি চেষ্টার প্রথম পর্ব বলে এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষাব্রতী ইংরাজি শিক্ষাবিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় রামমোহন রায়ের । তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন প্রগতিশীল জাতিসমূহের সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষা জরুরি । এই কাজে তিনি সহায়ক রূপে পান ডেভিড হেয়ার , এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট প্রমুখকে । এঁদের সকলের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ যেখানের ছাত্ররা ছিল এই শতাব্দীর নবজাগরণের প্রথম বার্তাবহ । বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান হল হিন্দু কলেজ। এই কলেজের তরুণ অধ্যাপক ড্রামণ্ডের শিষ্য ডিরোজিও ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় অধ্যাপক এবং বাংলার নবজাগরণের একজন অগ্রদূত । রাজনারায়ণ বসু শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিওর গুণাবলী বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন “তিনি কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন । কিন্তু ছাত্রেরা তাহাঁকেই অধিক চিনিত , প্রধান শিক্ষককে তত চিনিত না ।...তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে এমনি ভাল বাসিত যে অন্ধকার রাত্রি ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাগবাজার হইতে ইটালি যাইতে সংকোচ করিত না ।” [১০] প্রাচীনপন্থী ভারতীয়দের কাছে তিনি অপ্রিয় ছিলেন। কলেজে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দেবার কারণে কলেজের অধ্যক্ষেরা তাঁর প্রতি বিরক্ত হওয়াতে তিনি নিজের ইটালিস্থ বাসায় উপদেশ দিতেন ছাত্রদের। ডিরোজিওর প্রধান লক্ষ্য ছিল, ছাত্রদের মনে তীব্র অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা । কোন বিষয়ে শিক্ষা দেবার পূর্বে তিনি সে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি তার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে দিতেন । ছাত্ররা তাতে লাভবান হতো। বিদ্যাশিক্ষা করে কেবল ছাত্ররা ক্ষান্ত থাকত না , বাস্তব জীবনে ও সমাজে তার প্রত্যক্ষ প্রায়োগিক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকতো ।

সেসময়ে আর কোনো শিক্ষক এরূপ ভাবে ছাত্রদের মনে অনুপ্রেরণা জাগাতে পারেননি বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁর ছাত্র রাধানাথ শিকদার ।[১১] আসলে পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করানোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানবিদ্যার আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত রাখাই শিক্ষকের কর্তব্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ বলে মনে করতেন এই নবীন শিক্ষক।[১২] যদিও হিন্দু কলেজের বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে তার কারণেই কলেজের উন্নতি হয়েছিল তা সত্ত্বেও গোঁড়া পণ্ডিতসমাজের চাপে তাঁকেও ইস্তফা দিতে হয় কলেজ থেকে । সমাজের দাবিদাওয়াতে যেমন ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল ঠিক তেমনি সমাজের চাপে যোগ্য শিক্ষককেও ইস্তফা দিতে হয়েছিল ।

১৮৩৫ থেকে ১৮৫৪ – এই সময় পর্বটি ব্রিটিশ দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষা পরিচালনার দ্বিতীয়পর্ব । ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ফারসির বদলে ইংরাজি ভাষা সরকারি কাজকর্মের ভাষারূপে গৃহীত হয়। ফলে সরকারি চাকরীর লোভে হিন্দুরা দলে দলে ইংরেজি স্কুলে ভীড় করতে শুরু করে । প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরে দুলাল’ –এ বাবুরামও তার পুত্র মতিলালের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে “ফারসির চলন উঠিয়া যাইতেছে , এখন ইংরাজী পড়ান ভাল ।” ১৮৪৪ -এ লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন সরকারি কর্মচারী নিয়োগ ক্ষেত্রে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । এসকলের মধ্যে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সহৃদয় অ্যাডামের প্রস্তাব সরকার গ্রহণ না করায় দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার হাল সংকটজনক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়।

প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি দিয়েও যেখানে ছাত্র জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল না সেখানে সে সময় ইংরেজি স্কুলগুলিতে বেতন দিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছাত্ররা নিজেদের স্থান সংগ্রহ করতে পারছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বেশ তাৎপর্যবহ । উডের ডেসপ্যাচে(১৮৫৪) দেশীয় শিক্ষার রক্ষণাবেক্ষণের কথা উল্লেখিত হলেও তা রক্ষা করার

উৎসাহ সরকারের ছিল না । ফলত একটি সুপ্রাচীন শিক্ষাধারা, যা ত্রুটিপূর্ণ হলেও এতদিন দেশের জনসাধারণের শিক্ষার চাহিদার যোগান দিয়ে আসছিল তা অবলুপ্ত হতে থাকে ।

৫

পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশীয় শিক্ষা জগতে রূপান্তর ঘটিয়েছে । এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাহিত্যেও রূপান্তর ঘটতে থাকে।[১৩] সমাজ সচেতনতা , ব্যাক্তি সচেতনতা এই যুগের সাহিত্যের নববৈশিষ্ট্য । গদ্যে রচিত সাহিত্য যা পরবর্তীকালে উপন্যাস রচনাকে ত্বরান্বিত করেছিল তার বিকাশ এবং পরিপুষ্টি ঘটতে থাকে । নববৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে এই শতকের গদ্যসাহিত্যে চিত্রিত হতে থাকে সমসাময়িক সমাজজীবন যেখান থেকে বাদ পড়েনি সেসময়ের বহুল পরিবর্তিত , রূপান্তরিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং সমাজের মধ্যে সুনাগরিক সরবরাহকারী শিক্ষকের জীবনচিত্রও । ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের গদ্যরচনাকারদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রেখেছেন। তীব্র ব্যঙ্গকটাক্ষের মধ্যে দিয়ে তিনি রসযুক্ত গদ্য কাহিনীতে তৎকালীন সমাজের অসংগতিগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়'(১৮২৩) এবং 'নববাবুবিলাস'(১৮২৩) এই ধারার নিদর্শন। পরবর্তীকালে কলকাতার বাবু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে যে ব্যঙ্গ রচনার ধারা তৈরি হয়েছিল ভবানীচরনের রচিত এই সাহিত্যগুলিতে তার সূত্রপাত । ব্রিটিশের হাতের পুতুল সেজে সেকালের বাঙালী মুন্সী-মহারাজ, দালাল – গোমস্তা , ইজারাদার- বানিয়ানের দল উদীয়মান কলকাতা মহানগরীতে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। উনিশ শতকের প্রথম থেকে এঁদের দৌরাত্ম কমতে শুরু করে। এইসময় থেকে এঁদের বংশধরেরা সঞ্চিত পৈতৃক সম্পদের অপচয় ঘটিয়ে এক বিচিত্র বাবুসমাজ গড়ে তোলে ।[১৪]

যে সকল গদ্য সমূহে তৎকালীন সমাজের ঘটনা বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) রচিত 'আলালের ঘরে দুলাল'(১৮৫৭)। বাংলা সাহিত্যের জগতের প্রকাশ মাধ্যমে তিনি এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এলেন চলিত গদ্য ভাষায় 'আলালের ঘরে দুলাল' রচনা করে। উক্ত কাহিনীতে লেখক মতিলালের শিক্ষাগ্রহণের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের বাংলার সমাজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে অঙ্কন করেছেন । বহমান দেশীয় শিক্ষা ও নব্য প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এবং এই শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষকশ্রেণীর স্বরূপ কেমন ছিল তার সম্পর্কে একটা ধারণ পাওয়া যায় উনিশ শতকীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত কাহিনীটি থেকে। কলকাতার হঠাৎ সৃষ্ট ধনী এবং বাবু সম্প্রদায়ের কাছে লেখাপড়া শেখাটা যে শুধুমাত্র বিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা মতিলালের বিদ্যাচর্চা দেখলেই বোঝা যায় । পাঠশালার গুরুমশায়ের পাঠদানের রূপ চিত্রিত করতে গিয়ে লেখক জানাচ্ছেন গুরুমহাশয় ছাত্রদের লেখার নির্দেশ দিয়ে পায়ের উপর পা , বেত হাতে , দেয়ালে ঠেস দিয়া ঢুলছেন। আর "মতিলাল ঐ অবকাশে উঠিয়া তাঁহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর নাচ্ছে – গুরুমহাশয়ের নাক ডাকিতেছে – শিষ্য কি করিতেছে তা কিছুই জানেন না।" [১৫] পাঠশালার গুরুমশাইয়ের কর্তব্যে অবহেলার এই ছবির পাশাপাশি ফারসি শিক্ষকের যে রূপ তিনি তুলে ধরেছেন সেটাও প্রশংসাসূচক নয় –" মুন্সি সাহেবের দন্ত নাই , পাকা দাড়ি , শনের ন্যায় গোঁফ , শিখাইবার সময় চক্ষু রাঙ্গা করেন ও বলেন "আরে বে পড়" ও কাফ গাফ আয়েন গায়েন উচ্চারণে তাঁহার বদন সর্বদা বিকট হয় ।" প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির পরিণতি যখন এরূপ নিম্নমুখী তখন ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সরকার যে নব্য শিক্ষা ভারতবর্ষে চালু করেন তার গুণগত মানও যে উন্নত ছিল না সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন লেখক " ছেলেরা তামসডিস পড়িত , ও কথার মানে মুখস্থ করিত । বিবাহে অথবা ভোজের সভায় , যে ছেলে জাইন ঝাড়িতে

পারিত , সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাহবা দিতেন ।" রাজনারায়ণ বসু তাঁর স্মৃতিকথা মূলক রচনা 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে উনিশ শতকীয় ইংরেজি শিক্ষার যে নমুনা দিয়েছেন তাতে উক্ত চিত্রের সাদৃশ্যই প্রতীয়মান হয়। "সর্বপ্রথমে লোকের ইংরাজী পড়িতে হইলে টামস ডিষ প্রনীত স্পেলিং বুক , স্কুলমাস্টার , কাম্রূপা ও তুতিনামা এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত। যিনি রয়াল গ্রামার পড়িতেন ,লোকে মনে করিত তাঁহার মতো বিদ্বান আর কেহ নাই ।... লোকে বলিত রয়াল গ্রামার ময়াল সাপ।" [১৬] ইংরাজি শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য তখন শব্দের অর্থ মুখস্থ করার বিবিধ প্রণালী ছিল এবং সেটুকু করলেই সে শিক্ষিত তকমা পেতো । শুধুমাত্র ব্যাবসায়িক কাজের প্রয়োজনে যে শিক্ষাব্যবস্থা জন্ম নেয় তার এরূপ পরিণতিতে অস্বাভাবিকতার কোন কারণ থাকে না। ইংরাজি শিক্ষার জগতের এরূপ দুর্দশার মোচন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল হিন্দু কলেজ।

উনিশ শতকীয় গদ্যসাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার । শিক্ষা ব্যবস্থার মান এবং স্বরূপ কেমন হওয়া উচিৎ সে নিয়ে দেশীয় পণ্ডিত সমাজে একটা জাগরণ উঠেছিল। ডিরোজিও –এর উদার শিক্ষানীতিতে দীক্ষিত শিষ্য প্যারীচাঁদ এ সম্পর্কিত অভিমত প্রকাশ করেছেন আলালে । লেখাপড়া শেখার তাৎপর্য তাঁর মতে এই যে, "সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র হইবে – সুবিবেচনা জন্মিবে ও যে২ বিষয় কর্মে লাগিতে পারে , তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে । এই অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্বপ্রকারে ভদ্র হয় ও ঘরে বাহিরে সকল কর্ম ভালরূপ বুঝিতেও পারে- করিতেও পারে ।" তিনি মনে করেন "...শিক্ষা দিতে হইলে , বাপ মারও যত্ন চাই – শিক্ষককেরও যত্ন চাই। ... বাপের দেখাদেখি পুত্রের সৎ স্বভাব আপনা আপনি জন্মে ও মাতারও আপন শিশুর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।" [১৭] শিক্ষকের আদর্শ সম্পর্কে গুরু ডিরোজিও যে মতাবলম্বী ছিলেন শিষ্য প্যারীচাঁদকেও সেই মতকেই সমর্থন করতে দেখা যায় এ নব রীতির গদ্যে রচিত

আলালের কাহিনীতে "শিক্ষকের কর্তব্য যে শিষ্যকে কতকগুলি বহি পড়াইয়া কেবল তোতা পাখী না করেন। যাহা পড়িবে তাহা মুখস্থ করিলে স্মরণশক্তির বৃদ্ধি হয় বটে , কিন্তু তাহাতে যদ্যপি বুদ্ধির জোর ও কাজের বিদ্যা না হইল , তবে সে লেখাপড়া শেখা কেবল লোক দেখাবার জন্য। শিষ্য বড় হউক বা ছোট হউক , তাহাকে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে , যে পড়াশুনাতে তাহার মন লাগে – সেরূপ বুঝান শিক্ষার সুধারা ও কৌশলের দ্বারা হইতে পারে –কেবল তাইস করিলে হয় না ।" [১৮] শিক্ষা প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীর অবদান থাকাও জরুরী " যদি ছেলেদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাহারা যে স্কুলেই পড়ুক আপন২ পরিশ্রমের জোরে কিছু না কিছু অবশ্যই শিখিতে পারে । " [১৯] আলোচ্য কাহিনী পর্যালোচনা করে শিক্ষাব্যবস্থার রেখালেখ্য বিষয়ে প্যারীচাদের ধারণা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হল শিক্ষা পদ্ধতি কোন একক কর্মপ্রচেষ্টা নয়। শিক্ষকের একার উপরেও এই কর্মকাণ্ডের সফলতা নির্ভর করে না । এটা এক বৃহৎ ও মহৎ কর্মযজ্ঞ যেখানে সন্মিলিত প্রয়াস দরকার ।

প্যারীচাঁদ এই রচনায় শিক্ষকদের অযোগ্যতাকে যেমন চিহ্নিত করেছেন তেমনি তাঁদের অসহায়তার প্রসঙ্গটিও এড়িয়ে যাননি । ষোড়শ শতকের আলোচনায় দেখা গেছে চৈতন্য জীবনী কাব্যে জগন্নাথ মিশ্রের সহধর্মিণী শচীদেবী অনুযোগ করেছেন অধ্যাপনা বৃত্তির অসহায়তার দিকটিকে নিয়ে । অধ্যাপনা বৃত্তি তাদের অর্থকষ্টে জর্জরিত সংসারকে মুক্ত করতে না পারায় পৌরহিত্য বৃত্তি গ্রহণ করার অনুরোধ করেন তিনি জগন্নাথ মিশ্রকে । এ অনুযোগের প্রায় তিন শতক কেটে যাবার পরেও সমাজের পণ্ডিত শ্রেনীর অবস্থানগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আর সেকারণেই একই উপলব্ধি শুনি 'আলালের ঘরে দুলাল' কাহিনীর উনিশ শতকের পাঠশালার এক গুরুমহাশয়ের কথায় - "বোধ হয় গুরুমহাশয়গিরি অপেক্ষা সরকারি ভাল , ইহাতে বেতন দুই টাকা ও খোরাক পোশাক –

উপরি লাভের মধ্যে তালপাতা ,কলাপাতা ও কাগজ ধরিবার কালে এক একটা সিধে ও একে এক জোড়া কাপড় মাত্র , কিন্তু বাজার সরকারি নিত্য কাঁচা কড়ি।" [২০] আলালী ভাষাকে অবলম্বন করে এরপর কালীপ্রসন্ন সিংহ রচনা করলেন ব্যঙ্গাত্মক ঢঙে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬১) । এই গ্রন্থের 'মহাপুরুষ' নামক নক্সাটিতে হুতোম পাঠশালাকে ভয়ানক বলে অভিহিত করেছেন - "পাঠক! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক ...পণ্ডিত ও মাষ্টারকে যেন বাঘ বিবেচনা হচ্ছে । [২১] "আমরাও স্কুল ছাড়লেম । আঃ! বাঁচলেম গায়ে বাতাস লাগলো ।" কেন পাঠশালা কে যমালয় মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তর রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল'-এ পাওয়া যায় । তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন "গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না এবং তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্রদিগের দণ্ডের বিধানটি বড় কঠোর ছিল । নাড়ুগোপাল অর্থাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া হাতে প্রকাণ্ড ইষ্টক অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাখানো, বিছুটি গায়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার নির্দয় দণ্ড প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল ।... গুরু মহাশয় অতি ভীষণ পদার্থ ছিলেন । আমার স্মরণ হয়, আমি যখন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ করিতাম তখন রামনারায়ন নামে আমার এক জন সহাধ্যায়ী ছিলেন । তিনি কোন দোষ করিলে, গুরু মহাশয় যখন রামনারায়ন! বলিয়া ডাকিতেন , তখন তাঁহার ভয়সূচক একটি শারীরিক ক্রিয়া হইত ।"[২২]

হুতোম পাঠশালার পণ্ডিতকে সুযোগসন্ধানী এবং উৎকোচ ভোগীও বলেছেন "... এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে বেড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে বড়মানুষের বাড়ীর রাধুনী বামন ছিলেন, এডুকেশন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায়, সেন বাবুর সুপারিশে ও পিন্সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন । পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে ভালোবাসতেন, সুতরাং সকলেই তাকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুষ্ট কত্তে ত্রুটি কত্তো না; পণ্ডিত মহাশয় মাঠে আসবামাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে ; আমরাও এক

দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম ।”[২৩] সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন পয়সার নিমিত্তে পণ্ডিত সম্প্রদায় সকল প্রকার কাজ করে -“ ... এঁদের মধ্যে অনেকের চতুষ্পাঠীতে সংবৎসর ষাঁড় হাগে, সরস্বতী পূজোর সময়ে ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটি বঙ্গদেশীয় ছাত্র সাজেন... এঁরা পয়সা পেলে না করেন, হ্যান কর্মই নাই । [২৪] কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এই দীনতা শিক্ষক সমাজের । কেবলমাত্র শিক্ষকদের যোগ্যতাহীনতায় এর জন্য দায়ী নাকি এর দায় বর্তায় সমসাময়িক পরিস্থিতিরও উপরেও । দারিদ্র্য যে সর্বগুণনাশিনী তা তো পরবর্তীকালের কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের সৃষ্ট চরিত্র পলাশবুনির পণ্ডিতের মুখেও শুনতে পাওয়া যায় ।

অ্যাডামের রিপোর্ট, বিভিন্ন আত্মচরিত এবং সমকালীন বিভিন্ন সাহিত্যে যখন শিক্ষককে এরূপ ভয়ানক শাস্তিপ্রদানকারী রূপে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ঠিক তখন বাঙ্গালী ছাত্রসমাজ পেলেন এক ব্যাতিক্রমী শিক্ষক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, ছাত্রদের উপর নির্যাতন হয়েছে শ্রবণমাত্র যিনি অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্ত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না। প্রখর বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন , যুক্তিবাদী মানুষটি প্রথম যোগ্য শিক্ষক নির্মাণের জন্য প্রশিক্ষণের চিন্তাভাবনা করেন এবং সেইসঙ্গে শিক্ষক সম্প্রদায়ের আর্থিক নিরাপত্তার দিকটি নিয়েও চিন্তাভাবনা করেন ।

শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামতকে পাথেয় করে তিনি শিক্ষাসংস্কারে পথে নেমেছিলেন । শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর চিন্তাভাবনা এবং কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে এই মতামত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষণীয় বিষয় এবং পদ্ধতি – এই দুইদিকে আবশ্যকীয় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তিনি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে প্রথম চাকরি পাওয়া থেকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে হ্যালিডের মিনিট (বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সম্পর্কিত মতামত থেকেই অনুপ্রাণিত হন) পর্যন্ত

বিদ্যাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনা বিশ্লেষণে দেখা যায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক , শিক্ষণীয় বিষয় সব উপাদানগুলির সমন্বয়ে শিক্ষা প্রক্রিয়া কেমন করে সুষ্ঠু ও ফলদায়ক হতে পারে সেই পরিকল্পনাই করেছেন তিনি সর্বদা । ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৮ – বারো বছরের এই সময়পর্বের মধ্যে দীর্ঘ ন'বছর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পরিচালনা এবং শিক্ষার ব্যাপারে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে এই সময় তিনি শিক্ষাসংস্কারের চারটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। সহকারী সম্পাদক হয়ে একটি ,সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে একটি , অধ্যক্ষ হয়ে হ্যালিডের মারফত একটি, এবং ব্যালাণ্টাইনের মতামত প্রসঙ্গে একটি- এই চারটি বিবৃতিই ছিল তাঁর শিক্ষাসংস্কারের প্রধান পরিকল্পনা যেখানে তিনি চেয়েছিলেন মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার এবং উন্নত বাংলাভাষার ভিত্তির উপর সমৃদ্ধশালী বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইনের মতবাদের বিরোধিতা করে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংসদের কাছে শিক্ষাবিষয়ক যে বিবৃতিটি তিনি পেশ করেন সেখানে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় লেখেন -

"The natives of Bengal appear to be very eager to receive the benefit of education. ... What we require is to extend the benefit of education of the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be

free from the prejudices of their country.” তিনি আশা রাখতেন এবং বিশ্বাস করতেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা তাদের পড়া শেষ করে বাংলা ভাষার এরূপ আদর্শ শিক্ষক হবে।

শিক্ষার আদর্শ ঠিক কি হওয়া উচিত বা কি কি বিষয় পাঠ্য হওয়া দরকার , এবং কি প্রণালীতে পাঠদান প্রয়োজন , শুধুমাত্র সেই চিন্তাভাবনার মধ্যেই বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে আবদ্ধ রাখেননি । বরং একটি কলেজকে শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এবং পঠনপাঠনের কাজটি সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে যে প্রশাসনিক দক্ষতার প্রয়োজন , তাও তাঁর নজর এড়ায়নি । তাঁর এই সুগভীর শিক্ষাচিন্তায় স্থির হয়েছিলো শিক্ষার লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে শিক্ষনীয় বিষয় , শিক্ষার মাধ্যম , ও পদ্ধতি , ভাষার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষভাবে আলোকপাত করেছিলেন তিনি । তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত এই সমস্ত কার্যাবলীকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে -

১) শিক্ষাদর্শ নির্ণয় -- সংস্কৃত কলেজে থাকাকালীন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষণীয় বিষয় এবং পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে যে যুগান্তকারী মতামত বিবৃত করেছিলেন ‘Notes on the Sanskrit College’ –এ, তা শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ।

২) পাঠ্যপুস্তক রচনা – বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে স্কুল পাঠ্য বই ও অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টিতে মন দেন।

৩) শিক্ষাবিস্তার -- ১৮৫০ – ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেথুন বিদ্যালয় কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চারটি জেলায় কুড়িটি মডেল স্কুল অর্থাৎ বঙ্গ বিদ্যালয় , নর্মাল স্কুল অর্থাৎ শিক্ষক – শিক্ষণ ,

পয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । এছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্যও করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন বিদ্যাসাগরের অন্যতম কীর্তি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগরচরিতে' বলেছেন 'বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। উত্তর কলকাতায় শঙ্কর ঘোষ লেনে ১৮৫৯ সালে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় পতিতপাবন সেন , ঠাকুরদাস চক্রবর্তী , গঙ্গাচরণ সেন , মাধবচন্দ্র ধাড়া প্রমুখদের উৎসাহে । বিদ্যাসাগরকে এই স্কুলে নতুন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি এই স্কুলের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন । ১৮৬৪ সালে এই স্কুলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন'। এই বছরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুমোদন চাওয়া হয় বি এ পর্যন্ত পাঠের জন্য। কিন্তু সে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের ইংরেজ সদস্যদের ধারণা ছিল ইংরেজ শিক্ষক ছাড়া ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সেই ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙ্গে দেয়। ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি ফার্স্ট-গ্রেড কলেজে পরিণত হয় এবং ১৮৮১ সালে বি এ পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম ছাত্র পাঠানো হয়। ১৮৮২ সালে এই প্রতিষ্ঠানে ল'ক্লাস খোলা হয়।

নারীশিক্ষা বিস্তারেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গটি পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা সমন্বিত বৈজ্ঞানিক আধুনিক শিক্ষা যার মাধ্যম হবে বাংলা সেই শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব

করেন। সেজন্য তাঁর শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষক – শিক্ষণ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। তিনি মনে করতেন বিষয় সম্পর্কে বৈদগ্ধ্য হলেই হবে না তাকে যথাযথ পদ্ধতিতে শেখাতেও হবে। এর আগে মিশনারিদের শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষক – শিক্ষণ বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচ্য হতে দেখা যেতো। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব দূরীভূত করার জন্য কলিকাতা স্কুল সোসাইটি শিক্ষকদের স্বকার্যে শিক্ষালাভ করার উদ্দেশ্যে স্কুল স্থাপন করে । তারও আগে মে সাহেব ১৮১৭ তে টিচার ট্রেনিং স্কুল সর্বপ্রথম চালু করেন । প্রত্যেক স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে তাদেরই ট্রেনিং স্কুলে নিয়ে এসে বছরের কয়েকবার উপদেশ দেওয়া হতো । এই সকল শিক্ষার্থীদের বেতন দিতে হতো না। এ সকল স্কুলে শিক্ষা নেবার জন্য লোকে অত্যধিক আগ্রহী ছিল বলে উল্লেখ করেছেন মিঃ লাসিঙটন তাঁর "Historty of Calcutta Riligious and Benevolent" এ। বিদ্যাসাগর তাঁর সমস্ত উদ্যম পরিচালিত করেছিলেন সেই সকল গুণাবলী সমন্বিত শিক্ষক অনুসন্ধানে যারা "নিজেদের ভাষায় সুশিক্ষিত হবেন, বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবেন এবং দেশের প্রচলিত কুসংস্কার থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকবেন ।" [২৫] দেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায়ের তোষণ করার যেমন তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না তেমনি আবার তিনি দেশীয় পাঠশালার অনুপযুক্ত গুরুমশাই যাদের কারণে দেশীয় পাঠশালার শোচনীয় অবস্থা তাঁদের পরিদর্শকদের সাহায্যে উপযুক্ত করে তোলার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন ।

বিদ্যাসাগরের 'আখ্যানমঞ্জরীর' অন্তর্গত 'গুরুভক্তি' আখ্যানটি উপন্যাস পূর্ববর্তী প্রথম অনূদিত গদ্য কাহিনী যেখানে শিক্ষক জীবন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা মূল বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে । ইংরাজি ইতিহাস – নির্ভর কাহিনীর অনূদিত গ্রন্থ 'আখ্যানমঞ্জরীর' রচনাকাল ১৮৬৪। বিদ্যাসাগরের পাঠক মাত্রেরই একথা জানা, সূক্ষ সাহিত্যবোধ এবং

সংস্কৃত ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের সহায়তায় যে সুললিত গদ্যের তিনি নির্মান করেছিলেন তার সাহায্যে তিনি অনুবাদ করেছিলেন একের পর এক অনুবাদ সাহিত্য। ভাবানুবাদমূলক এই সাহিত্য রচনা সম্ভারগুলির বেশীরভাগই ছিল পাঠ্যপুস্তকধর্মী রচনা যা ছিল তাঁর শিক্ষাসংস্কারেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং যার লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ।

প্রয়োজনের নিরিখেই তিনি সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী ছিলেন ।'গুরুভক্তি' আখ্যানটিতে অপত্য স্নেহের অন্তরালে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষার জন্য আবশ্যক – শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ এবং শিক্ষক ও তার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যেই তা সম্ভব।

অধ্যক্ষ রূপে দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি নিজেও শিক্ষকের প্রতি এই কর্তব্যটি প্রতিপালন করার চেষ্টা করেছেন । বাংলা শিক্ষার জন্য তিনি যে দাবি দাওয়ার কথা উত্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত । তিনি বলেন কর্মস্থানেই শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে এবং গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে সেই বেতনক্রম নির্ধারিত হবে । মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন " এত কঠিন মানুষটি ভিতরে ভিতরে কত কোমল ও রসিক ছিলেন , তা ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়। শিক্ষকদের অসুখ করলে তিনি তাঁদের আলাদা অ্যালাউন্স দিতেন , এবং মাইনে থেকে তা কাটতেন না।" [২৬]

পণ্ডিতমশাইদের শিক্ষাদান পদ্ধতির অক্ষমতা যে দেশীয় গ্রামীণ পাঠশালাকে অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে এ প্রসঙ্গকেই বিষয়বস্তু করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'গ্রাম্যকথা' রচনাটিতে। 'গ্রাম্যকথা' গদ্য কাহিনীটি 'লোকরহস্য'(১৮৭৪) এর অন্তর্গত।

‘লোকরহস্য’এর সমস্ত রচনাকেই যদিও লেখক প্রবন্ধ বলে অভিহিত করেছেন তাও আলোচ্য রচনাটিকে চরিত্র নির্মাণ , বিষয় নির্বাচন , সমাজ ভাবনা – এসব দিক বিচার করে ছোটগল্পের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। [২৭] বাংলা সাহিত্যের প্রথম একক কাহিনী যার বিষয়বস্তু শিক্ষা এবং শিক্ষক সমস্যা। পাঠশালার পণ্ডিত সম্পর্কে লেখক খুব একটা সম্মানীয় চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেননি। তাঁর ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘মনুষ্য ফল’ নামক প্রবন্ধে তিনি অধ্যাপকদের ‘ কণ্টকময় ধুতূরা ফল’ বলেছেন। এঁদের পুঁথিগত পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু বাস্তবে তার কার্যকারি ভূমিকা নেই। বড় বড় লম্বা সমাসে , বড় বড় বচনে , এঁদের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতরা । ‘গ্রাম্যকথার’ পণ্ডিত ছাত্রদের বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষা দিতে অপারক কারণ তাঁর “সংস্কৃতজ্ঞান ঐ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত পর্যন্ত ”। তাঁর এই অক্ষমতা কে ঢাকতে তিনি ছাত্রদের প্রহার করেন বলে মনে করেছেন লেখক।

৬

উনিশ শতকের সমাজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দীর্ঘ আলোচনায় দেখা গেল ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনে বাংলায় শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালিত হয়েছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। প্রাচ্য না পাশ্চাত্য কোন মাধ্যমে শিক্ষা পরিচালনা করা হবে এই নিয়েই চলেছিল দীর্ঘ টালবাহানা। পাশ্চাত্য শিক্ষা যদিও সংকীর্ণ বাঙালী সমাজে বহুল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল , পুরনো জীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তর আনতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু এও সত্য যে, ব্রিটিশ রাজত্বেই শিক্ষা শুধুমাত্র পরীক্ষা পাশের মাধ্যম এবং চাকরি পাবার উপায় হয়ে ওঠে । নতুন শিক্ষার প্রবর্তনে দেশীয় শিক্ষা এবং দেশীয় পাঠশালার পণ্ডিত শ্রেণীর

অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পূর্বে ইংরাজি শিক্ষার হালও ছিল সঙ্গীন । অথচ রাজভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরাজি হওয়াতে ইংরাজি শেখার প্রবণতা বাড়তে থাকে । মেকলের মিনিটের মধ্য দিয়ে বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম রূপে ইংরাজির প্রচলন শুরু হয় । যদিও সমাজে তখন ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা বেড়েছিল কিন্তু তারও একটা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভূমিকা ছিল । এমতাবস্থায় সমাজের দর্পণ সাহিত্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষক শ্রেণীর কাহিনী ফুটে উঠেছে তা অধিকাংশই ব্যাঙ্গাত্মক। শুধুমাত্র বিদ্যাসাগরের রচনায় শিক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে ।

উৎস ও তথ্য নির্দেশ

১) আচার্য. পরমেশ, 'বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা', অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ-২

২) তদেব , পৃ-৩

৩) চক্রবর্তী জনার্দন , 'স্মৃতিভারে' , জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , কলিকাতা , দোল পূর্ণিমা ১৩৬১, পৃ-১০

৪) সুর.অতুল , 'আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী' , সাহিত্যলোক, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ-১০১

৫) তদেব, পৃ-১০২

৬) তদেব, পৃ-১০৩

৭) তদেব , পৃ-১০৩

৮) সরকার. গোপাল, 'বঙ্গদেশে বর্তমান শিক্ষাবিস্তার' , পৃ-৫৪

৯) ঘোষ. বিনয় , 'বিদ্রোহী ডিরোজিও', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ-১৬

১০) বসু.রাজশেখর, 'জীবনচরিত', পৃ ২১- ২৬

১১) ঘোষ. বিনয় , 'বিদ্রোহী ডিরোজিও', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ-৩৫

১২) তদেব, পৃ-৩৭

১৩) গুপ্ত. সুশীল কুমার, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ (১৮০১-১৮৬০)', এম মুখার্জি এন্ড কোং (প্রাইভেট লিমিটেড) , কলকাতা , পৃ-১৪৬

১৪) ঘোষ. বিনয় , 'বিদ্রোহী ডিরোজিও', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১০,পৃ-২২

১৫) মিত্র. প্যারীচাঁদ, 'আলালের ঘরের দুলাল' , বন্দ্যোপাধ্যায়. ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস. সজনীকান্ত (সম্পাঃ) , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ , কলিকাতা, পৌষ ১৩৬২ পৃ -২

১৬) তদেব, পৃ- ১৯

১৭) তদেব, পৃ- ১২

১৮) তদেব, পৃ- ১২

১৯) তদেব , পৃ -১১

২০) তদেব , পৃ- ২

২১) সিংহ. কালীপ্রসন্ন, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', কলকাতা, ১৮৬২, পৃ -৪৫

২২) বসু. শ্রী রাজনারায়ণ, 'সেকাল আর একাল', বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত, শকাব্দ ১৭৯৬, পৃ-৭

২৩) সিংহ. কালীপ্রসন্ন, ‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা’, কলকাতা, ১৮৬২, পৃ- ৪৬

২৪) তদেব, পৃ- ৫৬

২৫) ঘোষ. বিনয়, ‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ’ , ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান , দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পৃ-১৮০

২৬) ঘোষ. বিনয়, ‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ’ , ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান , দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা , পৃ- ৩৪৭

২৭) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (সম্পাঃ), ‘আচার্য কাহিনী’ , কলকাতা, বৈশাখ ১৪১১, পৃ- V

৪

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ ও শিক্ষকসমাজ

সমগ্র ভারতবর্ষে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের ন্যায় বিশ শতকের প্রথমার্ধেও ব্রিটিশ সরকার এবং স্বদেশীয় শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দর মধ্যে বাদানুবাদ চলতেই থাকে। বাদানুবাদ অবশ্যসম্ভাবী ছিল কারণ, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাধ্য হয়েই যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল ইংরেজ কোম্পানী তার ধারা পরবর্তী প্রায় দুশো বছরের রাজত্বকালের সমগ্র অংশ জুড়েই ব্যাপৃত ছিল। এই সময়পর্বে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক , মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা - এই তিন প্রকারের শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে বহু সংস্কার সাধন করেছিল ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু সবেরই মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের কর্তৃত্ব কে দৃঢ় করা। এই শতকের প্রথম দশকে বাংলার গভর্নর লর্ড কার্জন যে প্রথামিক শিক্ষা দানের কথা বলেছিলেন তার উদ্দেশ্যও ছিল ইংরেজদেরই স্বার্থপূরণ । ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চাইছিল প্রাথমিক শিক্ষাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ।

১৯০৫ এর পর থেকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি ধারার প্রচলন দেখা যায় । একটি ছিল কার্জনের অধীনস্থ মানোন্নয়নমূলক শিক্ষা সংস্কার এবং অন্যটি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ধারায় শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা ।

লর্ড কার্জন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসারের পরিবর্তে শিক্ষার উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্বও দেন ।

শিক্ষকদের কিন্ডারগার্টেন এবং গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন যাতে তাঁরা কৃষিজীবি অভিভাবকদের সন্তানদের উপযুক্ত কৃষিকাজ শিক্ষা দিতে পারেন। কার্জনের মতে গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের পাঠ্যক্রম ভিন্ন হওয়া উচিৎ। এছাড়া তিনি ভারতের শিক্ষা কমিশনের হার অনুযায়ী প্রাথমিক পরীক্ষার ফলাফলকে অবলম্বন করে সাহায্য দানের প্রথাকে রদ করেন। কিন্তু কার্জনের শিক্ষানীতিতে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের চেষ্টা ছিল না যা সে সময়ের জন্য প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া কার্জনের গঠিত শিক্ষা কমিটিতে ভারতীয়দের স্থানও সংকীর্ণ ছিল। কার্জনের শিক্ষা সংস্কার নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে তাই অসন্তোষ ছিলই।

কার্জনের বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ-ই " ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হয়ে ভারতীয় জাগরণের রূপ নিয়েছিল । জাতীয়তাবোধ, ভারতের মুক্তি অন্দোলন ওই জাগরণেরই স্বর্ণফসল" ।[১] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতির বিরোধিতা করে গোটা দেশ যখন আন্দোলনে নামে তখন শিক্ষক এবং ছাত্র সম্প্রদায় তাতে যোগ দেয়। সার্কুলেশন জারি করে সরকার আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে । এই নির্দেশের বিরুদ্ধে জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্যে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠন করেন । দেশের বিভিন্ন প্রদেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয় । এর পূর্বে বিছিন্ন কয়েকটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল । ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে ছেলেদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আন্দোলন শুরু হবার পূর্বেই । এই স্কুলের আদর্শ ছিল প্রাচীন ভারতীয় তপোবন। এই শিক্ষা আদর্শে গুরুকূল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামী দয়ানন্দ

সরস্বতী। ভারতীয় বৈদিক আদর্শের প্রতিচ্ছায়ায় বেশ কিছু গুরুকূল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন যেগুলি আধুনিক জীবনের কোলাহল থেকে মুক্ত ছিল। এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন ছিল শিক্ষকের। আদর্শ শিক্ষক কাকে বলা হবে – একজন শিক্ষকের চরিত্র কেমন হওয়া উচিৎ তা নিয়ে সমকালীন বাংলার মণীষীদের মধ্যে বিশষ করে রবীন্দ্রনাথের মননে আলোড়ন উঠেছিল। 'মাস্টারমশায়' গল্পের হরলাল সেসকল বিমূর্ত চেতনার প্রথম মানবীয় চরিত্র ।[২] জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আর একটা বড় দাবি ছিল – মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা। ইংরাজির পরিবর্তে একটি সর্বভারতীয় ভাষা সম্পর্কে গণচেতনা দেখা যায় এসময় । এছাড়াও অপর উল্লেখযোগ্য যে দাবিটি ছিল, তা হল সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি । মহামতি গোখলের নেতৃত্বে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। সরকার এ প্রস্তাব মেনে নিলেও বিল পাস করার পক্ষপাতী ছিল না । শেষপর্যন্ত নানামহলের নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে ১৯৩০ সালে পাস হয় গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম আইন। বাংলায় প্রথম প্রাথমিক আইন পাশ হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে ১৯২০-১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক আইন পাশ হয়। সমসাময়িক সমাজ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষক জীবনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, এই আইনের মাধ্যমেই প্রথমবার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ও শিক্ষক জীবনে সীমাবদ্ধ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও একটা আইনী-ব্যবস্থা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে যে শিক্ষা রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে একটি হল স্যাডলার রিপোর্ট । এই রিপোর্টের পরের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯১৯ সনের মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার এবং দ্বিতীয় ঘটনা হল অসহযোগ আন্দোলন । এই সময় প্রবর্তিত হল দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার । এই সময় থেকে ভোটাধিকারের মাধ্যমে মন্ত্রীত্ব প্রথারও সৃষ্টি

হয় । গণজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিষয়গুলি মন্ত্রীদের কাছে হস্তান্তরিত করা হয় । শিক্ষাকে এই নিয়মানুসারে হস্তান্তরিত বিষয় করা হয় এবং শিক্ষার ভার ন্যস্ত করা হয় প্রাদেশিক সরকারের উপর। প্রাদেশিক সরকারের উপরে দায় চাপিয়ে কেন্দ্র সরকার দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করে এবং সে সঙ্গে শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় সাহায্যেও ভাঁটা পরে এর ফলে। মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার রিপোর্ট সন্তোষজনক ছিল না ভারতবাসীর পক্ষে ।ফলত সমগ্র দেশ জুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভকে আটকাতে ব্রিটিশ প্রয়োগ করে কুখ্যাত দমননীতি ‘ রাওলাট আইন’। অন্যদিকে ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার একটা প্রয়াস অনবরত চালিয়ে যাচ্ছিল ব্রিটিশ সরকার । এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ে নতুন করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা হয় ভারতীয়দের পক্ষ থেকে। দেশের এরূপ সামাজিক পরিস্থিতিতে শিক্ষাব্যবস্থার হাল কেমন হয়েছিল তার জলছবি ‘ সন্দীপন পাঠশালা’।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষের দশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সময় ছিল অত্যন্ত অস্থির এবং সংকটময় ।নানা জটিল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ,অসন্তোষ ,আশঙ্কার মধ্য দিয়ে শাসক ও শাসিত উভয় গোষ্ঠীর সময় কাটছিল । বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও সে সময় কম উত্তপ্ত ছিল না । ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ সময়ে ভারতবর্ষে শিক্ষার অগ্রগতি সেরূপ ঘটেনি। বেয়াল্লিশের ভারতছাড় আন্দোলনে ভারতীয়দের নানা বিপর্যয়ের সন্মুখীনতা , বিশ্বযুদ্ধ শেষে কংগ্রেস , মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশদের মধ্যে চরম বিরোধিতার কারণে গঠনমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৩৫ এর ভারতের শাসন সংস্কার আইন ভারতবাসীর মনে আশা জাগালেও ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রিত্বত্যাগ সে আশাকে বিফল করে দেয়।

দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে ভারতে সবথেকে ক্ষতি হতে শুরু হয়েছিল আর্থিক দিক থেকে। গ্রামীণ অর্থনীতি তলানিতে এসে ঠেকেছিল। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মূদ্রাস্ফীতি বাংলার কৃষি-প্রধান গ্রামগুলিকে দীর্ণ করে দিয়েছিল। বেকারি, মন্বন্তর, কালবাজারি , চোরা কারবার,বোমার আতঙ্ক , বোমা বর্ষণ – এসকল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়া সমাজ কোনক্রমে এগিয়ে চলছিল। বিশ্বের টালমাটাল অবস্থায় পরাধীন ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অনেকটা এগিয়েও গেছিল ।

১৯০২-০৩ সাল থেকেই সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী অন্দোলন এবং ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির বীরত্ব , বোমার হামলা ,বিপ্লবীদের ফাঁসি ও আন্দামানে পাঠানো – ইত্যাদির ফলে বাঙালী জনমানসে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে । বিশ শতকের তৃতীয় দশকে অর্থাৎ ১৯২০-২১ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে একদিকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অন্যদিকে বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ড চলেছে । গান্ধীজির নেতৃত্বে লবণ-আইন অমান্যের উদ্দীপনা আর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে একই সালে, ১৯৩০-এ । গোটা দেশ জুড়েই ব্যাপৃত ছিল রাজনৈতিক অস্থির পরিবেশ। ত্রিশের দশকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে পড়েছিল সঙ্গীন। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মদতপুষ্ট জমিদার-জোতদারদের অত্যাচারও ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষার অবস্থাও ছিল তথৈবচ। বঙ্গ সরকারের অনুরোধে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে মাত্র আট মাসে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত যে রিপোর্ট ব্লিস সাহেব পেশ করেন সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে জমিদারদের বিরোধিতার কথা ছিল । জমিদারদের মতে চাষীর ছেলে স্কুলে আসা শুরু করলে তাদের রোদ , বাতাস সহ্য করার ক্ষমতা কমে যাবে । সেই কারণে তারা চাষের কাজকে ঘৃণা করবে।জমিদারদের বিরোধিতার অন্য আরেকটি কারণও বিদ্যমান ছিল । খসরাবিলে

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খাজনার প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা শিক্ষা কর ধার্যের প্রস্তাব ছিল । জমিদারদের কর দেবার পরিমাণ বলা ছিল টাকা প্রতি এক পয়সা আর প্রজাদের জন্য চার পয়সা। জমিদারগণ এক পয়সা কর দিতে রাজি ছিলনা।

এত সংস্কার , পরিবর্তন ,পরিবর্ধন যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল সেই ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে শিক্ষক সম্প্রদায় তাঁদের অবস্থা কেমন ছিল বা তাঁদের নিয়ে ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা এবারে পর্যালোচনা করা যাক।

এই কাল পর্বে শিক্ষকদের চাকরির অবস্থা ছিল শোচনীয়, বেতনও আকর্ষণীয় ছিল না । পেশাগত স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা,আয়ের সুরাহার অভাবের কারণে কোন যোগ্য ব্যক্তি জীবনধারণের উপায় রূপে এই বৃত্তির দিকে অগ্রসর হতে চায়নি। বেসরকারি স্কুলের অবস্থাও ছিল অনুরূপ , কখনো আবার এর থেকেও শোচনীয়। যে সকল শিক্ষক স্কুলে যুক্ত ছিলেন তাঁদের ট্রেনিং ব্যবস্থার অভাব ছিল। অতি সামান্য বেতন, চাকরির অনিশ্চয়তা ,পেনশন বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থার অভাব সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার বৃত্তিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সক্ষম হয়নি।

১৯২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয় ।সমগ্র প্রদেশের শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে । পরিচালন সমিতির স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করার জন্য আরবিট্রেশন বোর্ড গঠিত হয়। কিন্তু এসকল বোর্ড যে শিক্ষকদের অনুন্নত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি তার প্রমাণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিচার' গল্পতেই দেখতে পাওয়া যায় ।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধের দ্রুত পরিবর্তিত এই আর্থ – সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ কিভাবে প্রভাবিত করেছে এই সময় পর্বের কথাসাহিত্যিকদের তাঁদের কাহিনীতে শিক্ষক চরিত্র সৃষ্টিতে তা কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

৪.১) রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র সমসাময়িক কথাসাহিত্যে শিক্ষাজগৎ ও শিক্ষকসমাজ

১

শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ যখন 'মাস্টারমশাই' গল্পটি রচনা করেন তখন সমগ্র বাংলা জুড়ে চলছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। যে সকল লক্ষ্যবস্তুকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তার মধ্যে ছিল ভারতের নিজস্ব শিক্ষার একটা ঘরানা নির্মাণ করা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর মতে "দেশের লোককে শিশু কাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব ,অন্নে মরিব স্বাস্থ্যে মরিব,বুদ্ধিতে মরিব , চরিত্রে মরিব- ইহা নিশ্চয় ।"[৩]

২

একথা সর্বজন বিদিত গণ্ডীবদ্ধ শিক্ষালয় , শিক্ষক ও শিক্ষাদান পদ্ধতি , স্কুল –কলেজের বাঁধাধরা পাঠ্যপুস্তকের পাঠক্রম – যুগ প্রচলিত প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখিত ধারাগুলির কোনটির সাথেই রবীন্দ্রনাথের সুসম্পর্ক ছিল না।তাঁর রচিত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেও তার নিদর্শন পাওয়া যায় । 'পুরোনো বট' কবিতায় কবিকে স্বস্তি পেতে দেখা যায় 'বেত হাতে মাধব গোঁসাই'-কে দেখতে পায়নি বলে। কানাই মাস্টারকেও 'মাস্টারবাবু'

কবিতায় পোড়ো বেড়ালছানাটিকে পড়াতে বেত না মারলেও কাঠি দিয়ে মিছামিছি বেত বানাতে হয়েছে । 'ডাকঘর' নাটকের অমলের করুন আর্জি ছিল তাকে যেন পণ্ডিত হতে না বলা হয়। 'ছুটি' গল্পের ফটিক গ্রামের খোলা মাঠ থেকে কোলকাতার স্কুলে এসে এতটাই অস্থির হয়ে পড়ে যে , শেষপর্যন্ত সে বাঁচতেই পারলো না । 'ডিটেকটিভ' - শিক্ষক সংক্রান্ত গল্প না হলেও এখানে কথা প্রসঙ্গে শিক্ষক চরিত্রের প্রতি যে মনোভাব দেখানো হয়েছে তা মোটেই প্রশংসা সূচক নয় । ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিতকে এখানে উৎকট দুষ্কার্য সাধনকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এমনকি বিদেশে জন্মালে যে উন্নত মানের চোর হতে পারতো সে কথা বলতেও দ্বিধা বোধ করেননি। শিক্ষকদের চারিত্র্যলক্ষণ , মুখচ্ছবিতে পাষণ্ডপ্রতিমতা ,শরীরের দুর্বলতা ও অন্তরের কাপুরুষতা - কাহিনীতে বিবৃত এমন অশ্রদ্ধার প্রকাশ দেখে বোঝাই যায় শিক্ষকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । অথচ এই রবীন্দ্রনাথই আবার তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা নিকেতন সম্পর্কে বলেছেন '' Viswabharati is like the vessel which carries the cargo of my life's best treasure''। তাহলে কি স্কুলজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষক এবং শিক্ষালয় প্রসঙ্গটি নিয়ে এরূপ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল , যার ফলশ্রুতি উপরিউক্ত সাহিত্যগুলি ? বিদ্যালয়ে পাঠকালে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অব্যবস্থা নাকি রচিত সাহিত্যের সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রথাগুলি সম্পর্কেও তিনি একই মনোভাব পোষণ করতেন। সেক্ষেত্রে তিনি কি কোন আদর্শ কল্যাণকর গতিশীল সমাজোপযোগী শিক্ষাপদ্ধতিকে রূপায়িত করতে চাইছিলেন যার সুফলে দেশের জনগন তাদের প্রতিভা ও দক্ষতার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারবে।

৩

সমাজ প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত না হলেও শিক্ষালাভের জন্য তাঁকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বারংবার বিদ্যালয় পরিবর্তনও করতে হয়েছিল শিশু রবিকে। শৈশবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও তিনি সান্নিধ্যে এসেছিলেন বেশ কিছু গৃহ শিক্ষকেরও । এই সকল শিক্ষককুলের অধিকাংশের কাছেই শিশু রবির মন আশ্রয় পায়নি।[৪] স্মৃতিচারণমূলক রচনাগুলিতে তিনি তাঁর এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন । উদাহরণ হিসেবে 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত নর্মাল স্কুলের একটি বিবরণ দেওয়া যেতে পারে । ''নর্মাল স্কুলে হরনাথ পণ্ডিত নামে এক শিক্ষক ক্লাসে কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করতেন , তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম ।...অস্ত্রহীন হইলেও কি করিয়া শত্রুকে হারানো যাইতে পারে , সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ওই ক্লাসের পড়াশুনার গুঞ্জন ধ্বনির মধ্যে বসিয়া ওই কথাটা মনে মনে আলোচনা করিতাম , তাহা আজও আমার মনে আছে ।"[৫] ১২৯৮ সালে 'হিতবাদী' পত্রিকায় 'গিন্নী' নামে রবীন্দ্রনাথ একটি গল্প লেখেন । হরনাথ পণ্ডিতের নাম সাদৃশ্যে 'গিন্নী' গল্পের পণ্ডিত মশায়ের নামকরণ করা হয়েছিল শিবনাথ এবং গল্পের কাহিনীতেও জীবনস্মৃতির এই বর্ণনার মিল রয়েছে। একই প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে দেখা যায় বিশ্বভারতীর নবাগত কিছু ছাত্রকে তাদেরই অনুরোধে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে । তিনি বলেন, "আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি । সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারিনি ।"[৬] তাই একথা বলা যেতেই পারে সমকালীন স্কুলজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষক সম্পর্কে এভাবে ভাবিত করেছিল । বিদ্যালয়কে তাঁর মনে হয়েছিল

কারখানা। তিনি ব্যথিত হতেন প্রকৃতির বুক থেকে , মানব জীবনের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে শিশুদেরকে ঐ বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয় বলে ।

এই মহৎ আদর্শ নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করাকালীন জগদীশচন্দ্র বসুকে এক পত্রে তিনি জানান 'উপযুক্ত শিক্ষক' তিনি পাচ্ছেন না । এই একই পত্রে তিনি এও অনুযোগ করেন "এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্মযোগী করিতে পারিল না কেন ?"[৭] উল্লেখিত পত্র থেকে কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। যে উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান তিনি করছেন সেই উপযুক্ততা তিনি কোন কোন বৈশিষ্ট্যের নিরীখে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন? প্রথাগত ধারার শিক্ষাপদ্ধতিতে যিনি আস্থাশীল নন তিনি ঠিক কিরূপ এবং কেনই বা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করলেন? ইংরেজি বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর অনুযোগের কারণ কি ?

যে ধারণাতে তিনি তাঁর শিক্ষা দর্শন নির্মাণ করেছেন সেখান থেকেই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যাক।

তাঁর শিক্ষক সম্পর্কিত অভিমতগুলিকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত গুণাবলীগুলিকে পাওয়া যায় -ঃ

১) 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে শিক্ষকের গুণাবলী সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন "তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যারা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে , এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক ।"[৮]

২) শিশুকাল থেকে ছেলেদের মনে আমরা শিক্ষণীয় বিষয় ভারী করে চালাই ,তাতেই শিক্ষার আগ্রহ মারা পড়ে ...যে শিক্ষক যে বিষয়টি সর্বদাই নিজে পড়ে না , অন্যকে পড়ায় , তার শিক্ষকতার অধিকার নেই" ।[৯]

৩) “যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য”।

৪) “অন্তরে তাদের সমবয়সী না হ’তে পারলে তাদের কিছু দিতে পারা যায় না”

৫) “ তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে ,যাহা মূল্যের অতীত । তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন – লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন” ।[১০]

এবারে আসা যাক শিক্ষালয় প্রসঙ্গটির দিকে -ঃ

১) আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলিত অয়োজন কঠিন এবং কঠোর । এই শিক্ষাব্যবস্থার মূলে সামাজিক প্রয়োজনের তাগাদা ছিল ।

২) স্কুলকে তিনি মনে করেছিলেন শিক্ষা দেবার কল । যেখানে মাষ্টারমশাই দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত কলে ছাঁটা বিদ্যা পরিবেশন করেন কতগুলো বই এবং কতগুলো বিষয়কে ভাগ করে দিয়ে। এই পরিবেশিত বিদ্যার সফলতা পরিমাপ করা হয় নির্দিষ্ট একটি সময়ে নাম্বারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে । এই ধরণের নোট মুখস্থ বিদ্যার সঙ্গে মানব জীবনের কোন সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেন না । এরূপ অর্জিত শিক্ষা স্বার্থবুদ্ধি যুক্ত এবং মহৎ উদ্দেশ্য বিবর্জিত ।

৩) শিশুচিত্তকে বিদ্যা দেওয়ার নামে বন্দীগারে আবদ্ধ করা হয়। ‘অধ্যাপকের স্নেহ কল্যানে অভিষিক্ত’ করে যাতে তাদের মুক্ত করা যায় তিনি তাঁর চেষ্টা করেছেন শান্তিনিকেতনে উদার প্রকৃতিতে প্রাচীন বটের মাঝখানে।

তাঁর শিক্ষালয় এবং শিক্ষাকেন্দ্রিক এই সকল অভিমত কতটা প্রভাব ফেলেছে তাঁর রচিত কথাসাহিত্যে সেটা এবারে বিচার্য বিষয়।

৪

রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতির আধারে নির্মিত 'গিন্নী' গল্পে হৃদয়হীন ইস্কুল পণ্ডিত শিবনাথের অহেতুক রূঢ় লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে 'নিতান্ত বেচারা ভালোমানুষ' আশুকে। শিবনাথকে দেখলে বালকদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত কারণ শিলাবৃষ্টির ন্যায় চড় – চাপর আর তীব্র বাক্যবানের অত্যাচারে স্কুলের বালকদলের প্রাণ হয়ে ওঠে ওষ্ঠাগত । শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথের মতে" ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী । তারা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান" । [১১] গল্পের কোথাও সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ না থাকলেও আশুর মনে তাঁর বোনের সাথে খেলা নিয়ে যে একটা সংশয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় গল্পের বিবরণ থেকে "সে-যে বাড়ির কেহ, সে-যে বাপমায়ের ছেলে , ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারী একটা গোপন কথা, এটা সঙ্গীদের কাছে কোনমতে প্রকাশ না হয়, এই তাহার একান্ত চেষ্টা" । সম্ভবত পরিবার বা সমাজই তার মনে এই দ্বিধার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু বালকের সুকোমল মতিকে বোঝার চেষ্টা না করে শিবনাথ পণ্ডিত আঘাত হানলেন কোমল মনের ঐ নরম দ্বিধান্বিত অংশটিতেই । ঘটনাচক্রে আশু এবং তার বোনের পুতুল খেলার সাক্ষী হয়ে পড়া শিবনাথ পণ্ডিত আশুকে সমগ্র ক্লাসের মধ্যে গিন্নী নামকরণ করে তাকে হাস্যাস্পদে পরিণত করে। সমাজ প্রবর্তিত এই ভ্রান্ত ধারণাকে একজন সহৃদয় শিক্ষকের মতো তিনি ছোট আশুর মন থেকে মোচন না করে বরং লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণাকে কে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই সমস্ত স্কুলের ছেলেরা যখন তাকে গিন্নী বলে খেপাতে লাগলো আশুর মনে হলো ছুটির দিনে ছোট বোনের সঙ্গে খেলার মতো লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে । কিন্তু কি কারণে শিক্ষকের এই দুর্ব্যবহার

? অঘোরনাথকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন "... শিক্ষাপ্রণালী জড়যন্ত্রের মত একই পন্থা ধরিয়া এক প্রণালীতেই চিরকাল চলিতে বাধ্য , ইহাই আমাদের দেশের অধ্যাপন-ব্যাবসায়ীদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে , তা ছাড়া শিশুর মনকে তাহারা মন বলিয়াই গণ্য করিতে চান না। এইজন্য শিশুশিক্ষা কার্যে কোনো প্রকার যোগ্যতা বা বিবেচনাশক্তির প্রয়োজন নাই মনে করিয়াই আমাদের দেশে শিক্ষকতার কাজ চলিয়া আসিতেছে" ।[১২] স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের অভাব কতটা ক্ষতিকর হতে পারে এবং তার ফল কতটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে তা বিচক্ষণ শিক্ষাবিদ বর্তমান কালের মনস্তত্ত্ববিদের মতো তুলে ধরেছেন –

১) "পৃথিবীর লোক কোনকালেও যে সেদিনের কথা ভুলিয়া যাইবে ,এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না" ।

২) "এতদিন আশুর অনেক বয়স হইয়া থকিবে এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখদুঃখলজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই , কিন্তু সেইদিনকার বালক হৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনদিনের তুলনা হইতে পারে না" ।

বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুরু –শিষ্যের ন্যূনতম শর্ত পালন করার বিন্দুমাত্র স্বদিচ্ছা , ছাত্রের প্রতি সুব্যবহার শিবনাথ পণ্ডিত কখনোই করেনি অথচ সে বৈদিক যুগের গুরুভক্তির আশা করেছে ছাত্রদের তরফ থেকে । শিবনাথের মতো শিক্ষকদের জানা নেই যে গায়ের জোরে গুরু হওয়া সম্ভব নয় বরঞ্চ তিনিই গুরু যিনি গৌরব পান ।

১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'মাস্টারমশায়' গল্পটি শিক্ষক – ছাত্রের মধ্যে ভালোবাসার গল্প। জাতীয় বিদ্যালয়ের ভাবনা এবং সংগ্রাম , আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ১৯০৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভারতীয় উপাচার্য হয়ে নানা সংস্কারে ব্রতী হওয়া , সরকারি চাকরী

ছেড়ে দিয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে অরবিন্দ ঘোষের যোগদান ইত্যাদি ঘটনা তখন প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করছিল শিক্ষাভাবনায় । এই পটভূমিতে রচিত হয়েছিল 'মাস্টারমশায়'। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শিক্ষকের মাত্রাতিরিক্ত সহিষ্ণুতা এবং উদারতার ছবি। শিক্ষক রূপে হরলাল এতটাই সহিষ্ণু ছিল যে সে প্রিয় ছাত্রের হয়ে সমস্ত দাহ নিজের মধ্যে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছে । রবীন্দ্রনাথের মতে "গুরু – শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষা কার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে । কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর । কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকিতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশক হইয়া ওঠে । এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না" । [১৩] হরলাল শিক্ষকরূপে দায়িত্বভার নেবার পর ধীরে ধীরে সে স্থানটাই পেতে থাকে। কিন্তু এখানেই বাধা আসে পরিবারের তরফ থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রের এই সমস্যাটাকেও যেন গল্পে তুলে ধরেছেন গল্পকার। 'A poet's School' – এ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বলেন 'For me the obstacles were numerous. The tradition of the community which calls itself educated, the parents expectations, the upbringing of the teachers themselves, the claim and the constitution of the official University, were all overwhelmingly arrayed against the idea I had cherished.'

রবীন্দ্রনাথ একজন সমাজসচেতন স্রষ্টা হিসেবেই বেণুগোপালকে ফিরে যেতে দিয়েছেন তার আত্মসুখসর্বস্বতায় আবদ্ধ জগতে। কেবল নিঃশব্দ সঙ্গী হয়েছে মাস্টার মশায় এর 'চাহনি ' – জাতীয় বিবেক তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

‘ঘরে বাইরে ‘- চন্দ্রবাবু আদর্শ পবিত্র মূর্তি । চন্দ্রবাবুর প্রদেয় শিক্ষায় নিখিলেশ কল্যানের সত্য মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে । শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়িয়ে চন্দ্রবাবু তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি , ছাত্রকে জীবনের পাঠও তিনি দিয়েছিলেন । মানুষকে অশিক্ষা এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেবার মধ্যেই যে প্রকৃত দেশসাধনা হয় এই দৃষ্টিভঙ্গী ‘ঘরেবাইরে’ উপন্যাসে নিখিলেশ তার মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবুর কাছে পেয়েছিলেন । তিনি বিমলার আত্মস্খলনের মুহূর্তে তাকে বিপদমুক্ত করেছেন ।

৫

রবীন্দ্র সমসাময়িক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় , শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেও শিক্ষক চরিত্র স্থান পেয়েছে।

১৯১৪ সালে বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠককুলের সামনে শরৎচন্দ্র বৃন্দাবনকে শিক্ষক হিসেবে উপস্থাপিত করলেন তাঁর ‘পণ্ডিতমশাই’ উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে। পল্লীসেবার আদর্শবাদকে উপাদান হিসেবে এই কাহিনীর কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন তিনি। এই আদর্শকেই আবার প্রধান বিষয়বস্তু করেছেন তিনি পরবর্তী উপন্যাস ‘ পল্লীসমাজ ‘-এ । পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ উপন্যাসটির মাত্র একটি পরিচ্ছেদ (দশম) বর্ণিত হয়েছে শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ । বাকি সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে কাহিনী বিবর্তিত হয়েছে নারীমনের রহস্যময়তা , হিন্দুসমাজের নরনারীর চেতনায় বিবাহ প্রথার প্রভাব, গ্রাম্যতা , বর্ণ বিদ্বেষ , অন্ধ কুসংস্কার ইত্যাদি সহ আরও অনেক সমস্যা নিয়ে। বস্তুত শিক্ষার সমস্যাটি এসেছে শেষে। মাত্র একটি পরিচ্ছেদে এবং শেষে স্থান পেলেও এই অংশটির মধ্যে দিয়েই ঔপন্যাসিকের সমকালীন শিক্ষার পরিবেশ এবং আদর্শ শিক্ষকের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন সুচারুভাবে।

এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার করার যে যে সমস্যা সে সময়ের সমাজে উপস্থিত ছিল সেগুলির মধ্যে একটি হল তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের অবহেলা। এই অবহেলা সম্পর্কেই বৃন্দাবনের কাছে কেশব প্রশ্ন তুলেছে "আরো কত শত সহস্র গ্রাম রয়েচে সেখানে ক খ শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই । আচ্ছা , এ কাজ কি গভর্নমেন্টের করা উচিত নয় ?"এখান থেকেই গল্প রচনার সময়কাল সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, যা আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের একটি মূল বিবেচ্য বিষয় । ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গণশিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যাপক আলোড়ন উঠেছিল ভারতবর্ষের সমাজে । জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্য ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-বিস্তার হওয়া প্রয়োজন তা উপলব্ধি করে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে গণশিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারণের জন্য। এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল গোখলের নেতৃত্বে । ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে গোখলে বলেন মাতৃভূমির উন্নতির জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষা । এই উদ্দেশ্যে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ১৯ শে মার্চ আইন পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করেন যেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয় । এই প্রস্তাবে সরকারি এবং বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে মিশ্র কমিটি তৈরী করার কথাও বলা হয় । শিক্ষার ব্যয়ভার সরকার এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে নেবার প্রস্তাব ও সেখানে পেশ করা হয়। কিন্ত ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে আইনসভায় সরকারের তরফে বলা হয় দেশ এখনও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়নি । দেশের প্রতিবাদের রূপ প্রত্যক্ষ করে নানা টালবাহানার পর অবশেষে ১৯১৩ তে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কার্যকর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। নানা ব্যবস্থা অবলম্বন

সত্ত্বেও, শিক্ষা- বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণের পরেও দেশের অতি সামান্য সংখ্যক ছেলে মেয়েই শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছিল এবং দেশের এক বিরাট অংশ বঞ্চিত থেকেই যাচ্ছিল।

দেশের এই বিপুল সংখ্যক বঞ্চিত শ্রেণীকে নিয়েই চিন্তিত কেশব "আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি , যদি দেশের কোনো কাজ থাকে তো ইতর–সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া ।শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন , নিছক পণ্ডশ্রম । অন্তত আমার মত এই যে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও , তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাববে । ইঞ্জিনে স্টিম হলে তবে গাড়ি চলে নইলে এতবড় জড় পদার্থটিকে জনকতক ভদ্রলোক মিলে গায়ের জোড়ে ঠেলাঠেলি করে একচুলও নড়াতে পারবে না ।"

কিন্তু যে পদ্ধতিতে সে এই সমস্যার নিবারণ করতে চেয়েছিল তার মধ্যে কিছু ত্রুটি রয়েছে বলে মনে হয়েছে গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত বৃন্দাবনের । তার মনে হয়েছে দেশজোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্য করার দায় নিজের ওপরেও বর্তায় । আর একজন শিক্ষক হিসেবে তার কর্তব্য দেশ থেকে অশিক্ষা মোচন করা। তাই সে নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা –বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কে কার্যে পরিণত করে । আশাবাদী বৃন্দাবন বিশ্বাস করে পাঠশালার ছাত্ররা বড় হয়ে যদি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একটি ছেলে কেও পড়ায় তাহলে " বিশ বছর পরে এই বাঙ্গলাদেশে একটি লোকও মূর্খ থাকবে না।"

শিক্ষক হিসেবে বৃন্দাবনকে যেসকল গুনের অধিকারী রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেখানে পূর্বজ রবীন্দ্র শিক্ষকচিন্তার ছাপ পড়েছে।

১) বৃন্দাবন নিজের চেষ্টায় বাংলা লেখাপড়া শিখেছে এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে ইংরাজি শিখেছে। তখন থেকেই একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে সে। অর্থাৎ শিক্ষক হিসেবে জ্ঞানের চর্চা অব্যাহত রেখেছে।

২) শিক্ষক বৃন্দাবন সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল। "বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ যাঁহারা কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর বলিয়া ঘৃণা করে ।ইহারা হাজার রাগ হইলেও সামলাইতে পারে ..." । সহনশীলতার প্রতিমূর্তি বৃন্দাবন মনে করে শুধু ইচ্ছে এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না । "যাদের ভালো করবে ,তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চায়" তবেই পল্লীর উন্নতি সম্ভব হবে।

'পণ্ডিতমশাই' নামকরণের মধ্যেই বোঝা যায় শরৎচন্দ্র বৃন্দাবনকে যথার্থ শিক্ষক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন । এই যথার্থতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছিল নীতিবোধের নিরীখে ।রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট শিক্ষক হরলাল নিজের প্রাণের বিনিময়ে নৈতিকতার আদর্শকে জয়ী করে সদাজাগ্রত বিবেকের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন আর শরৎ সৃষ্ট পণ্ডিতমশাই বৃন্দাবন তার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান কে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে বাধ্য হয়ে নিজের সমস্ত উজাড় করে দিয়েছে পাঠশালা আর সমাজের নৈতিক উন্নয়নের জন্য।

আলোচ্য সময়পর্বের উল্লেখযোগ্য লেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরসের যে ধারা বহমান আছে তার অন্যতম রসস্রষ্টা হলেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় । **১৯১৯** সালের শারদীয়া মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকায় 'মাষ্টার মহাশয় ' গল্পটি প্রকাশিত হয় । ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার যে বেহাল দুর্দশা হয়েছিল তার হাস্যকর দিকটি নিয়ে রচনা করেন এই গল্প। নিতান্তই অর্থলোভে নানা পেশায় ঘুরে অবশেষে স্কুলের শিক্ষকের কাজ নিয়েছে ব্রজ মাষ্টার । শিক্ষক হারাণ মাস্টারের চারিত্রিক

সততা ,সরলতা ধূর্ততার কাছে পরাজিত হয়েছে সে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নন্দীগ্রাম এবং গোঁসাইগঞ্জ গ্রামের মুরুব্বিদের গ্রাম্যতা এবং অশিক্ষা।

৪.৩) তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে শিক্ষক সমাজ

১

বৈচিত্র্যপূর্ণ বিপুল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমাহার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের বিচরণ । রাঢ় অঞ্চলের সমাজের বর্ণগত বিভিন্ন শ্রেণীর সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিগত শ্রেণী ও যেখানে ভিড় করে আছে তাঁর সাহিত্যে সেখানে সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ পরিচিত শিক্ষক শ্রেণীর কথা বর্জিত হবার কথা নয়। তা তিনি করেনও নি।

শিক্ষা এবং শিক্ষককে কাহিনীর মুখ্য বিষয় করার কারণ সম্পর্কে 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসের ভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছেন " বাংলা দেশের শিক্ষক জীবন অবহেলিত , অনাদৃত। পাঠশালার শিক্ষক বা পণ্ডিতমহাশয়দের তো কথাই নাই। এদের সুখ – দুঃখ অবহেলিত, সমাজজীবনের সামান্যতম সম্মান থেকেও এঁরা বঞ্চিত।" এই অবহেলিত শ্রেণীর মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য পাঠক সমাজের সামনে আনার জন্য তিনি নির্মাণ করলেন যতীন পণ্ডিত, মধুমাষ্টার , চন্দ্রভূষণ সহ সীতারামের মতো চরিত্র, যে চরিত্রগুলি লেখকের কাছে 'বাস্তব'। সমালোচক অরুণ চৌধুরীর " তারাশঙ্কর যেমন জেনেছি ও বুঝেছি " গ্রন্থে বলেছেন "তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের বহু চরিত্রের পিছনে আছেন বিশেষ মানুষ । এই মানুষদের চিত্রিত করার কালেও তিনি কখনও তাঁদের বিকৃতি ঘটাননি। ঐসব চরিত্রের প্রতি স্রষ্টা হিসেবে তাঁর যে প্রতিশ্রুতি, তা তিনি কোথাও ভঙ্গ করেননি।"[১৪] 'সন্দীপন পাঠশালা'র ভূমিকাসহ উপন্যাসটি এবং শিক্ষককেন্দ্রীক বাকি ছোট গল্পগুলি পড়লে স্পষ্ট হয়ে ওঠে

যে তিনি মূলত শিক্ষকদের জীবনের চরম আর্থিক দুর্গতি এবং সামাজিক প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চনার প্রসঙ্গটিকেই গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন। ন্যূনতম সম্মান থেকেও যে শিক্ষক সমাজ কতটা বঞ্চিত তা 'সন্দীপন পাঠশালা'র হতদরিদ্র পলাশবুনির পণ্ডিতের মুখেই শোনা যাক "এই বড় বড় দালান-কোঠা হয় , দেখেছ ত?তা রাজমিস্ত্রীতে গাঁথে , নকশা কাটে, কারিগুরি দেখায়; মাইনে নিয়ে বিদেয় হয় ; বড়লোক বাস করে, বাড়ি হয় তাদের।তবু রাজমিস্ত্রীদের নাম মিস্ত্রীরা লিখে রেখে যায়- ওমুক রাজ , এত শো এত সাল ইত্যাদি ইত্যাদি । মোট কথা তাদের নামটা থাকে।মজুরিও তারা মন্দ পায় না। আমাদের পণ্ডিতদের চেয়ে বেশি পায়। কিন্তু দেখ , গোড়াতেই প্রথম যারা কাজ করে , ভিত কাটে ... মাটি কাটা মজুর ,তাদের কেউ মনেই রাখে না । তাদের মজুরিও সকাল থেকে তিন প্রহর পর্যন্ত মাটি কেটে তিন-চার আনা। পেটে খেতেই কুলোয় না । তারা শেষ বয়সে না খেয়ে মরে । ইস্কুল–কলেজের মাস্টাররা হল ছোট রাজমিস্ত্রী, বড় রাজমিস্ত্রী । আর হতভাগ্য আমরা পাঠশালার পণ্ডিত ,আমরা হলাম ভিত খোঁড়ার মাটি –কাটা মজুর । আমাদের কেউ মনে রাখে না "। [১৫] পলাশবুনির পাঠশালার পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও সে নিজের কুলবৃত্তি পুরোহিতবৃত্তি পরিত্যাগ করে পাঠশালা খুলেছিলেন একসময়।কারণ সেসময়ের সামাজিক পরিস্থিতিতে "পণ্ডিতের কাজ, পটোঝাড়া বামুনের কাজের চেয়ে অনেক সম্মানজনক," রাঁধুনি বামুনের কাজের কথা তো ভাবতেই লজ্জা হয়।" কিন্তু বর্তমানে সরকারি 'এইড 'র চার টাকা এই কন্যাদায়গ্রস্ত পণ্ডিত পিতার সংসারকে অচল করে দিয়েছে। আর্থিক অনটনে এখন সে ভিক্ষুকে পর্যবসিত হয়েছে, এমনকি লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটাতেও টান পড়েছে। পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে ভাবতে যে "পৈতৃক বৃত্তি" ছেড়ে লেখাপড়া শিখে সে ভুল করেছে । সে দেখেছে পুরুতের রোজগার, রাঁধুনি বামুনের রোজগার শিক্ষকদের থেকে বেশী। এমনকি লেখাপড়া না শেখা

খানসামারাও খোরাক মাইনের ওপরে পোশাক পায় পরার জন্য। পলাশবুনির পণ্ডিতের সাথে নিজের শিক্ষকতার জীবনের কোন পার্থক্য না খুঁজে পাওয়া সীতারামকে তাই কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতেই বলতে শুনি “চামচিকা পক্ষী হল”। কিন্তু শিক্ষককুলের এই চরম দুর্গতির নেপথ্যে কোন কারণ নিহিত আছে ? সে কারণ কি সামাজিক , রাজনৈতিক নাকি অর্থনৈতিক?

২

‘সন্দীপন পাঠশালা’ ১৯৪৫ -এ প্রথমে ‘কৃষক’ পত্রিকায় ’উদয়াস্ত’ নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিবেশ দেশজ শিক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে কিভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রচলন করে এবং তার ফলে শিক্ষকদের অবস্থান কিরূপ হয়ে পড়ে তারই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় সীতারামের চোখ দিয়ে।

১৩০০ সালের ক্রম পরিবর্তিত গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছে ‘সন্দীপন পাঠশালা’ উপন্যাসটি এবং শেষ হয়েছে দেশ স্বাধীন হবার পরের সময়কালে। এই বিস্তৃত সময়ের মধ্যে বিবৃত হয়েছে পাঠশালার পণ্ডিত সীতারমের জীবন কাহিনী। আর বিস্তৃত সময়কে কাহিনীতে বিধৃত করতে গিয়ে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলিকে আলোচ্য বিষয়বস্তু করেছেন-

১) সমাজ স্থিরীকৃত জাতিগত কৌলিক বৃত্তির পরিবর্তে শিক্ষা দ্বারা অর্জিত এবং ঐচ্ছিক বৃত্তি গ্রহণ’।

২) দেশের শিক্ষা এবং শিক্ষকের প্রতি সরকারি অবহেলা এবং শিক্ষকের দুর্দশার করুণ চিত্র।

৩) জাতি-ধর্ম , ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য দেশীয় শিক্ষার পরিবর্তে ঔপনিবেশিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের প্রসঙ্গ ।

৩

সীতারামের বংশ পরম্পরায় চলে আসা নিজস্ব কুলগত বৃত্তিকে পরিত্যাগ করে , পরিবর্তনীয় যুগের হাওয়া থেকে প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী সম্মানীয় বৃত্তি স্কুল শিক্ষক হবার স্বপ্নকে ছুঁতে যাওয়ার চেষ্টা এবং তার পরিণতির কাহিনী 'সন্দীপন পাঠশালা'।"রত্নহাটার ইস্কুলে এসেছেন এক তরুন সদগোপ শিক্ষক।চেয়ারে বসে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বাবুদের ছেলেদের গুরুগিরি করছেন। ... মণ্ডলেরা হেঁট হয়ে জমিদার ব্রাহ্মণ কুমারদের প্রণামও জানায় । আজ আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল । সদগোপ মাস্টারকে দেখে তারা দাঁড়াল এবং সম্ভ্রমভাবে নমস্কার করল তাকে ।"[১৬] এই ঘটনা সীতারামের চোখে স্বপ্ন বুনে দেয়।এরপর থেকেই 'প্রতিষ্ঠার কমনা', শিক্ষক হবার বাসনা তাকে নিরন্তর তাড়া করে বেড়ায়।

এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার পথে তাকে সন্মুখীন হতে হয়েছে বিভিন্ন বাধার- নিজস্ব অক্ষমতাসহ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্ত রকমের বাধার। কিন্তু এসকল প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়া শিখে রত্নহাটার জমিদার বংশের সহায়তায় সে প্রতিষ্ঠিত করে তার পাঠশালা। কিন্ত স্কুল শিক্ষক হবার স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলার ফলে যে তার চলার পথ মসৃণ হয়ে গেছে এমন নয় বরং পূর্বের সকল বাধার সঙ্গে মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হবার মতো যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক বাধা। শেষ পর্যন্ত সমকালীন রাজনৈতিক নিয়ম-কানুনের একের পর এক ধাক্কায় সীতারাম এবং তার সন্দীপন পাঠশালাকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে হয় । সীতারামের এই জীবনের কথা লিখতে চেয়েছে উপন্যাসের আরেক চরিত্র ধীরানন্দ। সীতারামের একটাই আবেদন ধীরাবাবুর কাছে " এমনই করে লিখো। তবেই ঠিক লেখা হবে। নইলে তুমি যা লিখবে , সে হয়তো ঠিক হবে না । পাঠশালার পণ্ডিত সীতারামের জীবনী হবে না। ঠিক এমনি করে লিখো। "

কোনরকম রং চড়াতে সে বারণ করেছে। অর্থাৎ, সমাজ স্থিরীকৃত নিম্ন সম্প্রদায়ের ব্যাক্তি, দেশজ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান পাঠশালার পণ্ডিতদের জীবন বিবর্ণই ছিল তৎকালে ।

পাঠশালার জন্য কৃচ্ছসাধন, স্বার্থত্যাগ সীতারামকে কিছু কম করতে হয়নি। এক সময়ের স্বচ্ছল এই চাষী পরিবারটির অবস্থার অবনতি এতটাই হয়েছে যে অর্থাভাবে সীতারাম চোখের চিকিৎসা করাতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। সে জানে এবং মেনেও নিয়েছে পণ্ডিতের অভাব চিরন্তন " ছোট ঘরে বড় মন নিয়ে জীবন" কাটানোই তার ভবিতব্য ।তাই তাকে পলাশবুনির পণ্ডিতের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে হয়।

শিক্ষক জীবনের পরিণতি যে স্বেচ্ছা কৃচ্ছসাধন এবং আত্মত্যাগ সেই মতাদর্শ ঘিরেই তৈরি হয়েছে মতান্তর, এমনকি সম্পর্ক পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে "হেডমাস্টার" গল্পে চন্দ্রভূষণ বাবু এবং তার পুত্র ব্রজকিশোরের মধ্যে। " ইস্কুল –মাস্টারী আপনার যত ভালোই লাগুক আমার ভালো লাগে না । আপনি জীবনে যাহাকে বিলাস বলেন আমি তাহাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আপনি দুঃখের মধ্যে আনন্দ অনুভব করেন, ত্যাগ ও কৃচ্ছসাধনের গৌরব অনুভব করেন ; সে অনুভূতি আমার নাই।" যদিও এটি গল্পের অপ্রধান অংশ, এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু প্রধান শিক্ষক চন্দ্রভূষণের সঙ্গে সেকেন্ড টিচার সীতেশবাবুর মতবিরোধ । 'বিদেশী' পাশ্চত্য শিক্ষাদর্শে শিক্ষিত নাস্তিক শিক্ষক সীতেশবাবুর মতে ধর্মীয় আচরণ কোমলমতি ছাত্রদের যুক্তিবাদী চিন্তা – চেতনাকে প্রসারিত হতে না দিয়ে তাদের ঠেলে দেবে অন্ধ ভাবাবেগের দিকে। তাঁর মতে বিদ্যালয় ধর্মাচরণের স্থান হতে পারেনা। অন্যদিকে চন্দ্রভূষণ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছেন তাই তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন তার ছাত্রদের মধ্যে । "তাঁর জীবনের তপস্যার সকল পূণ্য এই ইস্কুলকে দিয়েছেন তিনি"। একমাত্র পুত্র

ব্রজকিশোরের মৃত্যুর পর তিনি উপলব্ধি করেছেন আধ্যাত্মিক অনুভূতি মনকে করে পবিত্র, প্রসন্ন , প্রচ্ছন্ন। সেকারনেই তিনি স্কুলে চালু করেছিলেন ধর্মসভা । কিন্তু এ যুগের ছাত্র সম্প্রদায়ের কছে এই উপলব্ধি মূল্যহীন। পুরাতন ভাবাদর্শ নবীন যুক্তিবাদের কাছে পরাভব মেনেছে   ‘‘আমার আদর্শ ওরা মানছে না,আমার কাল গত হয়েছে । ‘‘

৪

প্রাচীন –নবীনের দ্বন্দ্ব , যুগসন্ধির ক্ষণ তারাশঙ্করের বহু উপন্যাসে ব্যবহৃত পছন্দের প্লট। শিক্ষক সংক্রান্ত কাহিনীগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন । এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন রাজনৈতিক চেতনা এবং আধ্যাত্মিক চেতনাবোধের পরিকাঠামোকেও ।

একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে সাহিত্যের মাধ্যমে দেশের সেবা করতে চেয়েছিলেন তারাশঙ্কর ‘‘সক্রিয় রাজনীতির পথে দেশসেবার কর্ম আমি ছেড়ে যাচ্ছি আজ , সাহিত্যের পথে দেশসেবার কর্মের সংকল্প নিয়ে জেল গেটের বাইরে পা দেব ।এই নীতির আলোকে তাঁর শিক্ষা এবং শিক্ষক সম্পর্কিত ধারণাগুলিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। তাঁর ‘সন্দীপন পাঠশালা’ যেন স্বাধীনতা পূর্ব ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির দলিল ।সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে প্রথমবারের মতো **১৯১৯-১৯২১** সালে পৌরসভা ও গ্রামে অবস্থিত ইউনিয়ন এলাকাগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয় । এরপর **১৯৩০** সালে ‘ দি বেঙ্গল প্রাইমারী এডুকেশন অ্যাক্ট ‘ পাশ করা হয় ।উপন্যাসের প্রায় শেষাংশে এই আইন কার্যকরী হতে দেখি ‘‘সে ভাবে কালের পরিবর্তনের কথা। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার সন্দীপন পাঠশালা উঠে গিয়েছে গত চল্লিশ সালে। তখন ফ্রি প্রাইমারী ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। আপসোস তার ছিল না

। সে অক্ষম হয়েছে , অন্য দিকে বিনা বেতনে দেশের সবাই পড়তে পারবে ,সুতরাং এতে তার আক্ষেপের কি আছে।আক্ষেপ শুধু নামটা যদি থাকত" ।[১৭]

তাঁর সৃষ্ট শিক্ষক চরিত্রগুলিকে দেখে মনে হয় আদর্শবোধ,নৈতিক পাপ-পুন্যের চেতনা ,মার্জিত রুচি ও পরিচ্ছন্ন মন– প্রভৃতি গুণের অধিকারী করে তিনি আঁকতে চেয়েছেন তাঁদের। যেমন ,"কাকপণ্ডিত" গল্পের যতীন পণ্ডিত সকলের কাছে হাসির পাত্র হলেও সে সাধুভাষায় কথা বলা বন্ধ করেনা। কারণ হিসেবে সে জমিদারকে বলে " আমি ব্রাহ্মণ, শিক্ষকতা আমার কর্ম। হুজুর, আমি যদি অশুদ্ধ ভাষায় কথোপকথন করি , কিংবা ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দ প্রয়োগ করি, তবে আমার ছাত্রেরা কিরূপে শুদ্ধ এবং সাধু ভাষায় জ্ঞান লাভ করবে?" শুধু শব্দ প্রয়োগের সময়ই নয়, পড়াশোনার সকল বিষয়েই সচেতনতা অবলম্বন করা পাঠশালার বৃত্তিকে ভালবাসা ছাত্রদরদী এই শিক্ষকটির একটি বৈশিষ্ট্য। সে মনে করে "হস্তলিপি সুন্দর না হলে শিক্ষকতা করা চলে না । কারণ , ছাত্রগণ গুরুর হস্তলিপিকেই আদর্শ জ্ঞান করে সেইরূপ লিখিবার চেষ্টা করে।" শিক্ষকতা বৃত্তিকে ভালবাসে বলেই যতীনপণ্ডিত প্রচণ্ড অভাব সত্ত্বেও , শত কষ্টের মধ্যেও পাঠশালা চালিয়ে যায়। নিজে অভুক্ত থেকেও ছাত্রের জন্য তস্করতা করতেও পিছু হটেনা এবং সে কাজের জন্য সে অনুশোচনায় দগ্ধও হয়। যদিও সে জানে সে কাকপণ্ডিত,তার ছাত্রকে অন্যেরা লোভ দেখিয়ে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যাবে। সীতারামও বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যখন গোপনে দেখতে যাবার চেষ্টা করতো তখন সে নিজেকে শাসন করতো " সে একজন পাঠশালার শিক্ষক , তার জীবনে কলুষ থাকা উচিৎ নয় ।"

সীতারামের জীবনে রত্নহাটার পড়তি জমিদারবংশের রানীমা এবং তার বড় পুত্র ধীরানন্দের আদর্শ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে নিরন্তর। উপন্যাসের ধীরানন্দ চরিত্রটি কংগ্রেসের

সক্রিয়কর্মী।উপন্যাসের এই অংশটির সাথে মিল পাওয়া যায় "ধাত্রীদেবতা" র। ধীরানন্দের বক্তব্যতেই শোনা যাক শিক্ষা এবং শিক্ষক সম্পর্কিত ধারণাটি। শিক্ষার ক্ষেত্রে "পণ্ডিত -আপনাকে আমি রামায়ণের ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করি। কেন জানেন? আমার কাছে শিক্ষাই হল সত্যকারের পতিত- পাবনী ধারা। অশিক্ষার অভিশাপে অভিশপ্ত ভগ্নস্তূপে ঢাকা মানুষের আত্মাকে মুক্তি দেয় ।তারা সশরীরে মুক্তি পেয়ে উঠে আসে উচ্চতার স্বর্গলোকে । শুধু তাই নয় পণ্ডিত – মানুষের অন্তরের মর্ত্যলোকে নেমে আসে স্বর্গমন্দাকিনীর ধারা ,বেয়ে যায় প্রবল কল্লোলে , মানুষের ঊষর অন্তরকে করে উদারতার উর্বরতায় উর্বর,বিনয়ে করে তোলে স্নিগ্ধ,শ্যামলতায় সুশ্যাম সুন্দর ।তার তটে তটে গড়ে ওঠে প্রসন্ন মহত্ত্বের পবিত্র তীর্থস্থল ; গড়ে ওঠে দেশ –দেশান্তরের মানুষের সঙ্গে ভাব –বিনিময়ের সমৃদ্ধ বন্দর"।[১৮]

তারাশঙ্কর শিক্ষার সর্বজনীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেকারণে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সীতারাম একই মতে বিশ্বাসী ছিলেন "সীতারাম অনেক ভেবে দেখে ঠিক করেছে, ওরা হল প্রথম ভাগের রাখাল নামে দুষ্টু ছেলেটির শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথম তাকে পাঠশালায় ভর্তি করে ওদের অধিকার দিয়ে গেছেন। ওরা থাকবেই"। [১৯] তাই দুষ্টু ছেলেটির শিষ্য চণ্ডাল আকুর মধ্যেও শিবকে দেখতে পায় সে । আকুর উৎসাহ আর উদ্যোগেই সে নতুন উদ্যমে তার বন্ধ হয়ে পড়া ভাঙ্গা পাঠশালাকে পুনর্নির্মাণ করতে পেরেছিল।

শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু সান্দিপনী মুনির পাঠশালার নামে পাঠশালার নামকরণ করা হয়েছিল । নামকরণ করেছিল ধীরাবাবু। এখানেও পুরাতন পন্থী এবং নবীনের মতানৈক্য দেখতে পাওয়া যায়।সেজন্যই মানবধর্মে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী ধীরাবাবুকে দেখতে পাই

ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী সীতারামের লেখা পাঠশালার রিপোর্টে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ' শব্দটির পরিবর্তে 'মহামানবশ্রীকৃষ্ণ' করে দেয় । সীতারাম ঈশ্বর বিশ্বাসী হলেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। তার এই আধ্যাত্মিকতায় লেখকের নিজস্ব চিন্তাধারারই ছাপ পড়েছে যেন। 'মনের আয়নায় নিজের ছবি ' নামক আত্মসমীক্ষামূলক রচনায় তারাশঙ্কর লিখেছেন "চার পাঁচ বছর বয়স থেকেই ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস করি । নাস্তিক্যবাদ চর্চা করতে গিয়ে শান্তি পাই নি। মিথ্যা হয়ে গেছে , কারণ ঈশ্বরের মতই একটি সত্তার হাতছানিতে ।"

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক ,প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ । কারণ "শিক্ষা না হলে মানুষ সত্যকার মানুষ হয় না ,সে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়ের পক্ষেই ।"[২০] এই প্রথমিক শিক্ষাকেই আবশ্যকীয় এবং সর্বজনীন করার জন্য যে লড়াই এবং তার পরিণাম সে প্রসঙ্গকেই গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক তাঁর কাহিনীর শিক্ষক চরিত্র নির্বাচনে । তিনি দেখাতে চেয়েছেন জাতি , ধর্ম, বর্ণ নয় মানব সভ্যতার "দুটো জাত আছে শিক্ষিত আর অশিক্ষিত ।"[২১]

৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথা মূলক রচনা 'স্মৃতির রেখা'- তে লিখেছেন, "সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব । যে যুগে তারা জন্মেছে , তাদের চেষ্টা হয় সকল দিক থেকে সে যুগের একটা স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া। ...সাহিত্য শুধু জগৎটাকে কে কি চোখে দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তার আবাল্য-দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ ,হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন"।[২২] প্রবাদপ্রতিম এই সাহিত্যিক ব্যক্তিগত জীবনে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন

শিক্ষাকতাকে । শিক্ষকরূপে কর্মজীবনের প্রথমদিকে তিনি জাঙ্গীপাড়া ও হরিনাভি স্কুলে (১৯২০ সালের ২১ শে জুন এখানে নিযুক্ত হন) এবং শেষ জীবনে গোপালনগর স্কুলে চাকরি করেন। ১৯৪২ খী প্রথম দিক পর্যন্ত তিনি কলকাতার খেলাতচন্দ্র স্কুলে কাজ করেন।এই স্কুলকেই অবলম্বন করে তিনি রচনা করেন 'অনুবর্তন' (১৯৪২) । তাঁর প্রথম এবং একক উপন্যাস যেখানে অবজ্ঞাত শিক্ষক সমাজকে গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু করা হয়েছ ।" বিভূতিভূষনের জীবনাভিজ্ঞতায় লব্ধ তৎকালীন শিক্ষকবর্গের পেশাগত দিক এবং ব্যাক্তিগত জীবন চর্যার অনেক খুঁটিনাটি ধরা পড়েছে 'অনুবর্তন' -এ। লেখকের ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার গভীরতম অঞ্চল থেকে উঠে আসা ভাবনায় যদি সাহিত্যে স্থান পায় তাহলে লেখকের কথাকেই প্রামাণ্য হিসেবে ধরে নিয়ে বলা যেতে পারে যে 'অনুবর্তন' সহ বাকি শিক্ষক কেন্দ্রিক গল্পগুলি- 'অনুসন্ধান' ,'বিধুমাস্টার', 'মাস্টার মশায়' প্রভৃতিতে তাঁর নিজস্ব শিক্ষক জীবনের প্রভাব পড়েছে। ব্যক্তিগত সত্তা যে প্রভাব ফেলেছে তা অবশ্য গল্পগুলি পাঠ করলেই অনুভব করা যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে অবলম্বন করে রচিত উপরিউক্ত কাহিনীগুলিতে শিক্ষক সমাজকে এবং শিক্ষাসমস্যাকে কেমনভাবে উপস্থাপিত করেছেন বিভূতিভূষণ? শিক্ষকসমাজকে এই কথাকার তাঁর কথাসাহিত্যে কিভাবে উপস্থাপিত করেছেন, গবেষণার বিষয় অনুযায়ী সেটাই এখন অনুধাবন করার চেষ্টা যাক।

৬

আলোচ্য কাহিনীগুলি তে সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয় সম্পর্কিত যে যে উপাদান গুলিকে স্পর্শ করেছেন লেখক সেগুলিকে শিক্ষা সংক্রান্ত তাঁর মূল্যবান অভিমত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই উপাদানগুলিকে মোটামুটি শিক্ষক , শিক্ষাপদ্ধতি , শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত ধ্যানধারণা এরূপ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে মতামতগুলিকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

‘অনুবর্তন’ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের করাল গ্রাসে কলকাতার জনজীবনও হয়ে পড়ে অস্থির । জাপানী বোমায় প্রাণ হারানোর ভয়ে কাতারে কাতারে লোক শহর কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিতে থাকে গ্রামের পথে । জন-জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে থাকে কলকাতা শহরের । এমত পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা হতে থাকে যার থেকে বাদ পড়েনি ঔপনিবেশক সমাজের প্রতিভূ দাপুটে ক্লার্কওয়েল সাহেবের ‘মডার্ন ইন্সটিটিউশন’ টিও। প্রায় শূন্য হাতেই বাঁচার তাগিদে যদুবাবু , ক্ষেত্রবাবু, জ্যোতির্বিনোদবাবুর মতো শিক্ষকদের ফিরে যেতে হয় ‘আসসিঙড়ি’ ,’বেড়াবড়ি’ ,’তারাজোল’ ,প্রভৃতি গ্রামগুলিতে যেখান থেকে একসময় কলকাতা শহরে এসেছিলেন তাঁরা উপার্জনের আশায়। স্কুল কবে খুলবে বা আদপেও আর খোলার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নিয়ে ছিল সংশয়। ফলত চরম অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এসকল শিক্ষকের জীবন। সঙ্কটকালীন এই অবস্থায় রাষ্ট্র বা ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল কর্তৃপক্ষ কেউও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি শিক্ষকদের জন্য। অবশ্য ক্লার্কওয়েল সাহেব কিম্বা স্কুল কর্তৃপক্ষ এর পূর্বেও শিক্ষকগণের সঙ্কট মোচনের চেষ্টা তো করেনই নি বরং নিরন্ন দরিদ্র শিক্ষককুলকে উপদেশই প্রদান করেছেন আর না পোষালে অপমানজনক বাক্য ‘ মাই গেট ইজ ওপেন’। সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য নির্মিত স্কুলগুলির প্রতি সামাজিক প্রতিনিধি নিয়ে সংগঠিত স্কুল পরিচালনা কর্তৃপক্ষের যে দায়িত্বহীনতা তাকেই যেন লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন। অনুবর্তনের

ক্ষুদ্র রূপ 'অনুসন্ধান' গল্পেও পরিচালন কর্তৃপক্ষের নির্লজ্জ নিষ্পেষনের দিকটি নির্দেশিত হয়েছে ।

'অনুবর্তন' উপন্যাসটিতে শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করা হলেও সেখানে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অভিমত সেভাবে চোখে পড়ে না । প্রথমে দেখা যাক শিক্ষক প্রসঙ্গটি। শিক্ষকরূপে এখানে পাওয়া যায় নারায়ণবাবু, যদুবাবু , ক্ষেত্রবাবু , আলম প্রমুখ চরিত্রদের।

শান্তিপ্রিয় আদর্শবাদী নারায়ণবাবুর জীবনের একমাত্র ব্রত ছাত্রদের শিক্ষাগত মানোন্নয়ন এবং চারিত্রিক উন্নতি সাধন। কিন্তু তাঁর এই সু-উদ্দেশ্য সফল হয় না। এর কারণ হিসেবে উপযুক্ত শিক্ষণ বিদ্যার অভাবকেই চিহ্নিত করেছেন সমালোচক। " আসল কথা , নারানবাবু শিক্ষক হিসেবে আদর্শবাদী , কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না । গ্রামারের ভুল বা চরিত্রের দুরন্তপনাকে সংশোধন করা দরকার , এ কথা যত নিষ্ঠার সঙ্গেই আলোচনা করা যাক , সদিচ্ছার দ্বারা সমাধান হতে পারে না।...নিপুণ পরিচালকের অভাবে নারাণবাবু এমনিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেলেন, নারাণবাবুর চরিত্রের সত্যকার ট্র্যাজেডি এই জায়গাতেই"। [২৩] ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রসারের সময় শিক্ষকদের যে শিক্ষণবিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল যার প্রসঙ্গ শিক্ষা রিপোর্ট এবং কমিশনগুলিতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছিল তার বাস্তবায়ন হয়নি বলেই কি শিক্ষকের বিদ্যাদানের পদ্ধতিতে এই খামতি?

যদুবাবু, স্কুলের ফাঁকিবাজ এই শিক্ষক চরিত্রটির সবটাই প্রায় দোষের – মিথ্যাচারী , দুর্নীতিপরায়ণ ,স্বার্থপর ,সুবিধেবাদী। নিজের কাজে ফাঁকি দিতে সদা তৎপর। প্রতিবাদী কিন্তু কর্তৃপক্ষের সামনে ভীতু। শিক্ষকরূপে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা অসহনীয়। কিন্তু বোমা

পড়ার ভয়ে কলকাতা শহর ছেড়ে আত্মীয় বাড়িতে নিতান্তই অনাত্মীয়ের মতো পড়ে থাকা সহায় সম্বলহীন জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আত্মসমীক্ষারত এই মানুষটির যে স্বর পাঠক শুনতে পায় তাতে আর্থিক বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষটির প্রতি মমত্বই প্রকাশ পায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্লার্কওয়েল সাহেব কর্মনিষ্ঠ এবং ছাত্রবৎসল হলেও এ কথা সত্য যে তিনি আদর্শ প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে অক্ষম। বিলেতি ডিগ্রীধারী হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে তার জ্ঞান কম"। [২৪] এ কারণেই হয়তো ঔপনিবেশিক শিক্ষা এদেশীয় পরিবেশে ব্যর্থ হয় ।

স্কুলের গতানুগতিক হুকুমমানা হাঁসফাঁস করা শিক্ষকদের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে নতুনের হাওয়া নিয়ে এসে উপস্থিত হয় "নতুন মাস্টার" রামেন্দুবাবু। তিনি স্কুলের মধ্যে চলা জবরদস্তির নিয়মকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন । রামেন্দুবাবুর এই প্রয়াস শিক্ষকদের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও অবস্থার সুরাহা কিছু করতে পারেনি। বিভূতিভূষণ জীবন ও সাহিত্য গ্রন্থে সমালোচক এর কারণ সম্পর্কে বলেছেন "রামেন্দুবাবুর না আছে অস্মিতা না আছে সংগঠন শক্তি । চরিত্রের এই বড় দিক দুটিতেই তিনি অপরিণত । আবার আদর্শ শিক্ষক হবার মতো শিক্ষকতাবৃত্তি কিংবা শিক্ষানীতি তাঁর কিছুই জানা নেই।"

কিন্তু এই সকল শিক্ষক চরিত্রের মধ্যে একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী শিক্ষকের কেমন রূপ তিনি কল্পনা করেছিলেন ? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় উত্তম পুরুষে বর্ণিত 'মাস্টারমশাই' গল্পটিতে ।"সৌম্য মূর্তি" প্রশান্তবাবু হেডমাস্টার হয়ে এসেছিলেন বিষ্ণুপুর হাইস্কুলে। স্কুলসহ সমগ্র গ্রামের কাছে তিনি আদর্শ শিক্ষক হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন মধুরভাষী এবং "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি" । ছাত্রদের

সাহায্যের জন্য তিনি ছিলেন সর্বদা প্রস্তুত । "যে যখন যা প্রশ্ন করত তিনি তখনই তার উত্তর দিতেন । ছেলেদের মঙ্গলের জন্য তিনি সবসময় উন্মুখ ছিলেন ।" আর শিক্ষকের বৃত্তির সফলতা ফুটে ওঠে 'অনুবর্তন' উপন্যাসের অনুকূলবাবুর কথায় "...একটা বেলগাছের ষাট – সত্তর ব্যাপী জীবনে অত বিচি গাছ থেকে জন্মায় না - অন্তত দুটি বেলচারা মানুষ হয় , বড় হয় ,আবার বহু ফল দেয়। বহু অপচয়ের হিসেব কষেই এই পুষ্টির ইঞ্জিনিয়ারিং দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ভগবান । তার মধ্যেই অপচয়ের সার্থকতা । স্কুলের সব ছেলে কি মানুষ হয় ? একটা স্কুল থেকে ষাট বছরে দুটো একটা মানুষ বার হলেও স্কুলের অস্তিত্ব সার্থক । এই ভেবেই আনন্দ পায় নারায়ণ । প্রত্যেক শিক্ষক যিনি শিক্ষক নামের যোগ্য – এই ভেবেই তাঁর আনন্দ ও উৎসাহ । দেশের সেবার সব চেয়ে বড় অর্ঘ্য তাঁরা যোগান - মানুষ।"

বিভূতিভূষণের অন্যান্য রচনা বিশ্লেষন করলে দেখতে পাওয়া যায় যথেষ্ট সচেতনতার সাথে তিনি সমকালীন শিক্ষা এবং শিক্ষক সংক্রান্ত সমস্যাকে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর কাহিনীতে।

আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র 'আম আঁটির ভেঁপু ' পর্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে অপুর প্রথম খরগোশ দেখার আনন্দ- উৎসাহের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন "বালক বর্ণপরিচয়ে 'খ' –এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ রকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় , এ কথা সে কখনো ভাবে নাই ।" "খরগোশ!-জীবন্ত!-একেবারে তোমার সামনে লাফইয়া পালায় ; ছবি না , কাচের পুতুল না – একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোশ ! এইরকম ভাটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে !- জল মাটির তৈরী নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা যে সম্ভব তা ছয়-সাত বছরের অপুর কাছে অকল্পনীয় বিষয় ছিল। ঠিক একই বিষয়কে

প্রাসঙ্গিক হতে দেখি ‘অনুবর্তন’ –এর সংক্ষিপ্ত রূপ ‘অনুসন্ধান’ নামক ছোট গল্পতেও। সেখানে দেখতে পাওয়া যায় নারায়ণ বাবু তাঁর ছাত্রদের নদীর ধারে বসে আকাশের নক্ষত্র চেনাতেন। এমনকি সিলেবাস বহির্ভূত ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার জন্য শেষ পর্যন্ত ‘পাগলা মাস্টার’ আখ্যায় আখ্যায়িত নারায়ণ বাবুকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারও করে দেওয়া হয় । অর্থাৎ, লেখক শিক্ষায় ব্যবহারিক , প্রায়োগিক ধারাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন এ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান সেসময় একটি সর্বজন স্বীকৃত মাধ্যম রূপে পরিগণিত হতো।

এই উপন্যাসে হরিহর ছিল সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু সে শিক্ষা অপুর শৈশবেই অচল হয়ে পড়েছে তাই তারা নিরন্ন। দেশজ শিক্ষার শিক্ষকদের অবস্থাও যে সে সময় তথৈবচ তার উদাহরণ প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা এবং গুরুমশাই স্বয়ং। দেশজ পাঠশালায় বিদ্যা ও বিদ্যাদাতাকে ভয় করার মধ্য দিয়ে শিক্ষা কার্য সমাধা হতো। আর পাঠশালার গুরুমশাইয়ের সংসার চালানোর জন্য গুরুগিরির পাশাপাশি মুদির দোকান চালাতে হয় । তারাশঙ্করের “কাকপণ্ডিত” গল্পের যতীন পণ্ডিতকেও “ব্রাহ্মণহীন চাষীর গ্রামে গ্রামে দেবতার পূজা করা , ঘরে ঘরে ষষ্ঠী পূজা , লক্ষ্মী পূজা করা , মাঠে আখমাড়াইয়ের সময় শাল পূজা করা”র কাজ করতে হতো।

অপুর শিক্ষাকাল শিক্ষার ফিল্টারেশন নীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা চলার সময়। আর এই শিক্ষাও যে ভয়ানক ত্রুটিপূর্ণ তা বোঝা যায় সমালোচকের মন্তব্যে “কিন্তু শিক্ষালয়ের এই ত্রুটির জন্যই অপু অধিকাংশ বাঙালী ছাত্রের মতো আত্মকেন্দ্রিক আর ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রবাদী হয়ে রইল । সমাজের প্রতি তার কোন কর্তব্য জাগল না । দেশের অভ্যন্তরে কোথায় যে কি ঘটছে তার হিসাব সে কষতে চায় না।”

শিক্ষক সমাজের প্রতি সমসাময়িক সামাজিক অবমাননার দিকটিকেও লেখক চিহ্নিত করেছেন। যুদ্ধবিদ্ধস্ত অবক্ষয়িত সমাজে দরিদ্র স্কুল শিক্ষকের অবস্থা ছিল সঙ্গীন । ধনগর্বে স্ফীত অবিভাবকদের অবান্তর উপদেশ, টিউশন বাড়ির অন্দরমহলের অশিক্ষিত মহলের নানা অশোভন মন্তব্য সবই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে বাধ্য হতে হয় শিক্ষক শ্রেণীকে। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই চিন্তাধারা শাখা- প্রশাখা মিলে সম্প্রসারিত হয়েছে বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যেও । স্নেহের ভাষা তাই ছাত্রসম্প্রদায় বোঝেনা । অভিভাবক থেকে ছাত্র সকলেই অর্থের মানদণ্ডেই যাচাই করে নিতে চায় শিক্ষককে। তাই অবিভাবক যেমন বলে “ আপনি একটু ভাল করে দেখাশুনা করবেন বলেই তো রাখা। নইলে গ্র্যাজুয়েট মাস্টার দশ টাকাতেও পাওয়া যায়। “তেমনি ছাত্রও মনে করিয়ে দেয় শিক্ষক একজন বেতনভুক কর্মচারী মাত্র “মাষ্টার বাড়িতে রাখা ওই জন্যেই তো। এতগুলো করে টাকা মাইনে দিতে হয় ” ।

তীব্র আর্থিক অনটনই কি তাহলে সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীকে এরূপ পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে ? অর্থনৈতিক অসংগতির কারণেই তো “ ... ইহারা অল্পেই সন্তুষ্ট ,অভাবের মধ্যে সারা জীবন এবং যৌবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত করিয়া সংযম মিতব্যায়ে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ‘ ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্খা , সুখ – আহ্লাদকে দমন করে তো বটেই এমনকি সংসারধর্ম পালনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্য স্বল্পবেতনের স্কুলের চাকরির সঙ্গে সেকারণে কাউকে টিউশানি করে , কাউকে বা হোমিওপ্যাথি করে,কাউকে বা আবার জ্যোতিষ চর্চা করতে হয় । শিক্ষকেরা গত্যন্তরহীন কারণ প্রথমত, তৎকালীন বেকার সমস্যায় জর্জরিত সমাজব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়ত , দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের চাকরিব্যবস্থা।

৭

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘ অনুসন্ধান ‘ গল্পটিতে স্কুলশিক্ষকদের দুর্গতির কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্কুল সেক্রেটারির অমানবোচিত ব্যবহারের নিদর্শন তুলে ধরেছিলেন । ঠিক একই বিষয়কে কাহিনীর সারবস্তু হিসেবে গ্রহণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ‘টিচার’ নামক ছোট গল্পটি। কিন্তু বিভূতিভূষণ যেখানে শুধু সমস্যার কারণের প্রতিই দৃকপাত করেছেন মানিক সেখানে কারণ বিশ্লেষণের সাথে সাথে সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়েছেন । আসলে “স্বকালকে কোন লেখক কিভাবে গ্রহণ করবেন তা নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তি প্রবণতার ওপর । তাই একই কালে একই সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে বাস করেও সমকালের লেখকদের রচনায় কালের মাত্রা রূপটি ভিন্ন ভিন্ন ” হয়।

৮

সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী রাজমাতা হাই স্কুলের সেক্রেটারি রায় বাহাদুর অবিনাশ তরফদারের মজ্জায় মজ্জায় রয়েছে যেকোন অবস্থায় যেকোন ভাবে নিজের মুশকিল আসান করার কৌশল। বিত্তের স্ফীততায় স্থূল মানুষটির চারপাশে যে দরিদ্র ক্ষুধার্ত নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপেই উদাসীন সে। অথচ নারীমাংসলোলুপ এই মানুষটিই আবার যখন চোখের সামনে দেখে পুষ্টির অভাবে সত্যিকারের রোগা মেয়েক তখন তার “ ইচ্ছা করে টিপে-টুপে ছেনে-ছুনে দেখতে সত্যিকারের কঙ্কালসার তরুণীকে “। প্রতিবাদী গলার স্বরকে খুঁজে বের করে ‘এক চোট মজা ‘ দেখানোই যার প্রবণতা তার কাছে’ খেতে না পাওয়া লেখা ব্যাজ’ পরিহিত প্রতিবাদী শিক্ষকসমাজ তো চক্ষুশূল হবেই। তাই চক্ষুশূল অবিবেচক শিক্ষকদের মুশকিল

আসান করার জন্য যে তার পন্থা 'কিছু সদুপদেশ ' দেওয়া হবে সেটা সম্পর্কে নিঃসংশয়ে থাকা যায়। কিন্তু ,সামগ্রিকভাবে মানবমনের এবং মানবসমাজের অন্তর্গত জটিলতার অনুসরণ এবং তার কারণ অনুসন্ধানী ,মার্কসবাদী মানিক পূর্বজ কাহিনীকারদের মতো ভাববাদী চিন্তার স্তরেই থামিয়ে রাখলেন না তাঁর কাহিনীকে, তিনি বাঙ্গালী পাঠকের সামনে নিয়ে এলেন শিক্ষকসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে গিরীনকে । সংগ্রামী মানসিকতা ও আত্মসম্মান বোধের এক সমন্বিত চরিত্র গিরীন। সময় মতো সঠিক বেতন না পাওয়া , খেতে না পাওয়া , অভাবী টিচারদের প্রতি শিক্ষক বৃত্তির মহান আদর্শের জয়গানকারী রায় বাহাদুরকে ছেলের অন্নপ্রাশনে ডেকে এনে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন দরিদ্র মথিত সংসারের বারমাস্যাকে। শুকনো উপদেশের বানীর জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে টেনে নামিয়েছে গিরীন রায় বাহাদুরকে। গৌরবান্বিত শিক্ষকের অচল সংসারের দমবন্ধ করা যে নিখুঁত বিবরণ দ্রষ্টা মানিক দিয়েছেন তা যেন কঠিন আঘাত হানে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বিবেকের উপর । "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আসল ব্যাপার হল তাঁর নিজের চোখ । একেবারে জ্বলজ্বলে , ড্যাবড্যাবে এক জোড়া চোখ । বোধহয় তার রঞ্জনরশ্মিও ছিল । এমন আনকোরা নতুন চোখে জীবনকে তার আগে কেউ দীর্ঘকাল দেখেননি। আমাদের সমাজ , পরিবার ,প্রেম , ভক্তি ,বিশ্বাস সবকিছু দেখার ধরণ আগাপাশতলা বদলে গেল। "[২৫]

গিরীন রায় বাহাদুরকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যই এ কাজ করেছিল । অবশ্য এ ভয় পাওয়ানোর উদ্দেশ্য তথাকথিত 'রেড টেরর ' তথা সন্ত্রাস সৃষ্টি ছিল না ।উচ্চবিত্তের উন্নাসিকতার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্যই গিরীনের এ পদক্ষেপ । "শ্রেণী ঘৃণার এমন শিল্পীত প্রকাশ বিশ্ব সাহিত্যেও দুর্লভ।"[২৬]

৯

‘টিচার’ গল্পটি সংকলিত হয়েছিল ‘খতিয়ান’ গল্পগ্রন্থে । খতিয়ানের রচনাকাল ১৯৪৬-৪৭। এর কয়েক বছর পূর্বে ঘটে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । বিশ্বযুদ্ধ মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে নানা পরিবর্তন । সামাজিক পরিবেশ , অর্থনৈতিক চাপ , জীবনাভিজ্ঞতা ব্যক্তিমানুষের মূল্যবোধকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে বিশ্বযুদ্ধ। উক্ত সময় পর্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেহারাতেও দ্রুতগতিতে পালাবদল ঘটে চলেছিল। এসময় জনজীবনে প্রবল হয়ে ওঠে শ্রেণী চেতনার বোধ।এই শ্রেণীচেতনার বোধই শিক্ষিত , সাধারণ ,মধ্যবিত্ত মানুষকে সাহস যুগিয়েছে প্রতিবাদী , লড়াকু মনোভব গড়ে তুলতে । অস্থির এই সময়ের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলিকে জীবনের কাছে সত্য করে তুলতে চেয়েছেন তিনি। সমাজের অত্যাচারিত দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের বাঁচার লড়াইকে ,ভালভাবে বাঁচার ঐকান্তিক অভীপ্সাকে উপস্থাপিত করেছেন লেখক এই সময়ের সকল গল্পে। ব্যক্তি বিদ্রোহের তুলনায় সংঘবদ্ধ জীবনের সংগ্রামী সংকল্প ঘোষণাকে বড় করেছেন লেখক । টিচার’ গল্পে এই মনোভবের রূপটাই ধরা পড়েছে। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন মার্কসবাদই ” মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে। ‘মরব না সস্তায়’ গল্পে শিক্ষয়িত্রী সুরমাকে পেটের দায়ে রাঁধুনি হতে হয়েছে । রাঁধুনি বৃত্তির দায়ে তাকে সধবার বেশ পরিবর্তন করে বিধবার বেশ ধরতে হয়েছে । এ গল্পে সুরমার যে উপলব্ধি তাও যেন মার্ক্সীয় তত্ত্বের সর্বহারার সর্বজনীন বেদনাবোধকেই প্রকাশ করেছে।

দীর্ঘ এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় বিংশ শতকের প্রথমার্ধের দ্রুত পরিবর্তিত আর্থ – সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশে অবক্ষয়ের সূত্রপাত ঘটেছে। সেই অবক্ষয়িত সমাজে

নৈতিকতার আদর্শ শুধুমাত্র শিক্ষক সমাজের দায় বলে দেগে দেওয়া হয়েছে এবং তার যাঁতাকলে পিষ্ট দরিদ্র শিক্ষকেরা যুদ্ধবিদ্ধস্ত কালোবাজারে সন্তানসন্ততি, সংসার বাঁচাতে আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়েছে। এই সময় রাজনৈতিক সুবিধাভোগী ধনীশ্রেণী, রায়বাহাদুর , শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্থসম্পন্ন ব্যাবসায়ী প্রমুখেরা স্কুলপরিচালন সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। 'পেটের দায়ে' শিক্ষকতা বৃত্তি নেওয়া শিক্ষকগণ স্কুলের চাকরী বাঁচাতে বাধ্য হয়ে এই শ্রেণীর আনুগত্য পাবার অভ্যেস তৈরী করেছে।

উৎস ও তথ্য নির্দেশ

১) বসু. স্বপন, 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি' , দত্ত. হর্ষ সম্পাদিত , পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০ , পৃ -

২) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (সম্পাঃ) , 'আচার্য কাহিনী' , কলকাতা, বৈশাখ ১৪১১, পৃ- VII

৩) ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা , ভাদ্র ১৮১৭, পৃ-৩৭

৪) ভাদুড়ী. পিনাকী, 'রবীন্দ্রসাহিত্যে শিক্ষাপ্রসঙ্গ', ভৌমিক. তাপস সম্পাঃ , কোরক পত্রিকা , প্রাক শারদ সংখ্যাঃ ১৪১৯, কলকাতা পৃ-১৬১

৫) ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ , 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৭৬, কলকাতা, পৃ-২৬

৬) রায়. সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাঃ) , 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ শিক্ষাচিন্তা', গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ- ২০৫

৭) তদেব , পৃ- ৭৮

৮) ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা , ভাদ্র ১৮১৭, পৃ-২৪৯

৯) রায়. সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাঃ) , ‘রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ শিক্ষাচিন্তা’, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৮ , পৃ- ৩৩৯

১০) ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, ‘শিক্ষা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা , ভাদ্র ১৮১৭

১১) তদেব, পৃ-২৪৯

১২) রায়. সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাঃ) , ‘রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ শিক্ষাচিন্তা’, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৮ , পৃ-১২৪

১৩) ঠাকুর. রবীন্দ্রনাথ, ‘শিক্ষা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা , ভাদ্র ১৮১৭, পৃ-১৪২

১৪) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (সম্পাঃ) , ‘আচার্য কাহিনী’ , কলকাতা, বৈশাখ ১৪১১, পৃ-X

১৫) বন্দ্যোপাধ্যায়. তারাশঙ্কর, ‘সন্দীপন পাঠশালা’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,কলকাতা, আষাঢ় ১৩৬৯, পৃ- ১৪৩

১৬) তদেব , পৃ- ৮

১৭) তদেব , পৃ- ১৬১

১৮) তদেব , পৃ- ১১২

১৯) তদেব , পৃ- ১২৪

২০) তদেব , পৃ- ১১৫

২১) তদেব , পৃ- ১২৮

২২) বন্দ্যোপাধ্যায়. বিভূতিভূষণ, ‘স্মৃতির রেখা’, ক্যালকাটা পাবলিশার্স,কলকাতা, ১৩৬২, পৃ- ৪৫

২৩) চট্টোপাধ্যায়. সুনীল কুমার, ‘বিভূতিভূষণ জীবন ও সাহিত্য’, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ,অগ্রহায়ণ ১৩৭৭, পৃ-৪৮৬

২৪) তদেব, পৃ-৪৮৬

২৫) মুখোপাধ্যায় . অরুণ কুমার, ‘কালের পুত্তলিকা’ , দে’জ পাবলিশিং , কলকাতা,পৃ-৩৩৯

২৬) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (সম্পাঃ) , ‘আচার্য কাহিনী’ , কলকাতা, বৈশাখ ১৪১১, পৃ- XII

৫

৪র্থ অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষা জগৎ এবং শিক্ষক সমাজ

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল স্বাধীনতা প্রাপ্তি। এই শতকের মধ্যভাগে ভারতবাসীর কাছে কাঙ্খিত স্বাধীনতা এসেছে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। দেশভাগের যন্ত্রনা তখন সকলের মনের আশাকেই ভঙ্গ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল স্বাধীন ভারতে নতুন করে বাঁচার। অথচ এ স্বপ্নের যে বাস্তবায়ন ঘটেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই শতকের ষাট, সত্তরের দশকে বাংলায় ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু ঘটনা - খাদ্য আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন, একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধ নকশাল আন্দোলন , ৭২'য় উদ্বাস্তু সমস্যা , ৭৬' য় জরুরী অবস্থা প্রভৃতি থেকে।

স্বাধীন ভারতের সরকার কোনদিনই ভারতবাসীকে প্রসাশনিক দিক থেকে সম্পূর্ণ ভরসা প্রদর্শন করতে পারেনি। স্বাধীন দেশের এই সরকার এমতাবস্থায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও আমূল কোন পরিবর্তন আনেন নি বরং পূর্ববর্তী শিক্ষানীতিকেই কিছুটা সম্প্রসারিত করেছিলেন মাত্র। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে লিখলেন " বর্তমানে ক্ষমতা ও ব্যবস্থা যাঁহাদের হাতে তাঁহারা জনসাধারণ বলিয়া কথিত সমষ্টি-মানবের মানসিক বিকাশের সমস্যাটা প্রবলভাবে অনুভব করেনা । যেমন চলিয়া আসিতেছে , আপাততঃ তেমনি চলুক , এমন একটা নিরুদ্বিগ্ন মনোভাবের ফলেই বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষকগণ অবজ্ঞাত । সংস্কার যাহা হইয়াছে ও হইতেছে , তাহা সরকারি খবরদারীর কড়াকড়ি , শিক্ষার মানের উন্নতি ও বিস্তারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই । এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সম্ভব, লোকসাধারণের মধ্যে শিক্ষার দাবীটা প্রবল করিয়া

তোলা । অভুক্তের অন্নের জন্য যে আকাঙ্খা , নিরক্ষরের শিক্ষার দাবীটা তেমন স্তরে আসিয়া পৌঁছিলে গবর্ণমেন্টের টনক নড়িবে।" (আনন্দবাজার পত্রিকাঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩)। [১]

স্বাধীনতার পর সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কমিশন বসে। কিন্তু সে সকল কমিশনে বিবেচিত প্রস্তাব সবসময় ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি। এক ঝলকে কমিশনগুলির প্রতি একটু আলোকপাত করা যাক ।

১) রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮-৪৯) -ঃ স্বাধীনতার পরেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিপুল অনুসন্ধান ও তার উন্নতি সাধনে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে ভারত সরকার এই শিক্ষা কমিশন গঠন করেন । ১৯৪৮ সালের ৫ই নভেম্বর গঠিত হওয়া এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন । এই কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল দশ , যার মধ্যে তিনজন ছিলেন বিদেশী শিক্ষাবিদ । বাকি সাতজন ছিলেন দেশী শিক্ষাবিদ । কমিটির সদস্য সম্পাদক ছিলেন ডাঃ নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত । কমিশন ভারতের তৎকালীন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্যা সম্পর্কিত একটি ৭৪৭ পাতার রিপোর্ট কমিশনের কাছে পেশ করে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে । পরে এই প্রতিবেদন মূদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় । নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছিল কমিশনের বিচার্য বিষয় ।

- ভারতে বিশ্ব বিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ণয় ।

- বিশ্ব বিদ্যালয়ের গঠন , নিয়ন্ত্রণ , সীমা প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন ।

- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাথে বিশ্ব বিদ্যালয়গুলির সম্পর্ক নির্ধারণ ।

- আর্থিক সংগতি বা অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ।

- উপযুক্ত শিক্ষার মান বজায় রাখা ।

- পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষার সহিত সমতা রক্ষার মাধ্যমে পাঠক্রম প্রণয়ন ও পাঠক্রম সমাপ্তির সময় নির্ধারণ ।

- বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকার মান নির্ধারণ ।

- অধিক সংখ্যক বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা ।

২) মুদালিয়র কমিশন(১৯৫২-৫৩)-ঃ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ লক্ষণ স্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় । এই কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল নয় । নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছিল এই কমিশনের বিচার্য ।

- মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সঠিক লক্ষ নির্ধারণ করে সেই লক্ষে পৌঁছানোর পথ নির্দেশ ।

- সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ।

- তৎকালীন শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য সাধনের উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ।

- মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলির পুনর্বিন্যাস ।

- বিদ্যালয়গুলির পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ।

- শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নতিসাধন ।

৩) কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)-ঃ মুদালিয়র কমিশন শুধুমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার ওপরেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলো । তাছাড়াও এই কমিশন অষ্টম শেণির পর শিক্ষার বিশেষীকরণের যে সুপারিশ করেছিলো তা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি । এই কমিশনের বিভিন্ন ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালের ১৪ই জুলাই শিক্ষার সর্বস্তরীয় উন্নতির কথা মাথায় রেখে তৈরী হয় কোঠারি কমিশন । এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ডঃ দৌলত সিং কোঠারি । এই কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে আলোচ্য হিসেবে গ্রহণ করে ।

- শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ।

- মাধ্যমিকের পর শিক্ষার বিশেষীকরণ ।

- উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন ।

- ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রচলন ।

- শিক্ষার সাথে উৎপাদনের সংযোগস্থাপন ।

- শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষভাবে সমাজ সেবায় অংশগ্রহণ ।

- কৃষি শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, শিক্ষক – শিক্ষণের মতন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রণয়ন ।

- শিক্ষাক্ষেত্রে বাছাইনীতি (Selective approach) গ্রহণ ।

- শিক্ষায় সমসুযোগের নীতি গ্রহণ (Principal of Equal Opportunity) ।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণান কমিশনে গুরুত্ব আরোপ করা হয় উচ্চ শিক্ষার উপর। ফলত শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে ওঠার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয় এই কমিশনে। এই ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার ও গবেষণা প্রাধান্য পেলেও, সাক্ষরতার হার সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি । শিক্ষার ভার বন্টন হয়ে যায় রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের মধ্যে। ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির আনুষ্ঠানিক প্রবর্তন করা হয় । ১৯৮৬ সাল অবধি এই নীতির আর কোন পরিবর্তন হয়নি । ১৯৮৬ সালে হওয়া পরিবর্তন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার , নীতিবোধ ও জাতীয় ঐক্যের ওপর নজর দেয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ র মধ্যে ভারতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় তিনগুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রাজ্য সরকারগুলি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় সচেষ্ট হওয়ায় এবং চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হয়ে যাবার ফলে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় ঠিকই কিন্তু এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাকর্মী ও পরিকাঠামোগত অভাব রয়ে যায়।

নিজেদের স্বার্থে প্রশাসন এবং ক্ষমতাকে কাজে লাগানো , জনগণের চাহিদা পূরণের দিকে সরকারের উদাসীনতা দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। পঞ্চাশের দশকের শিক্ষক আন্দোলনই তার প্রমাণ। শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশার উন্নয়ন ঘটানোর

দাবিতে , শিক্ষকদের নূন্যতম বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ১৯৫৪ সালে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষক সম্প্রদায় আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আঠারো হাজার শিক্ষক একত্র হয়ে শিক্ষকদের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে। এটাই ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের প্রথম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

শিক্ষক আন্দোলনের দুটি অন্যতম দাবী ছিল মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী পয়ত্রিশ টাকা মহার্ঘ্য ভাতা এবং তিয়াত্তর থেকে একশো ত্রিশ টাকা বেতন । অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (এ. বি. টি. এ.) এই দাবী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পেশ করে । বিধানসভার বিরোধী পক্ষের হস্তক্ষেপে এ নিয়ে একটি বৈঠকও হয় । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই দাবী মানেননি এবং শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশ করা দাবিও প্রত্যাখ্যান করেন। ফলস্বরূপ শিক্ষকরা ধর্মঘট শুরু করেন । মণিকুন্তলা সেন , তার স্মৃতিকথায় শিক্ষক আন্দোলনের কথা তুলে ধরেছেন – " দেশের শিক্ষক সমাজও এই সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরাই এই সমস্যাগুলর সঙ্গে সবচেয়ে বেশী পরিচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান সমস্যা, ভর্তি সমস্যা, সিলেবাস সমস্যা, পরীক্ষা সমস্যা, ছাত্রদের বেতন সমস্যা, বিদ্যালয়ের খরচ সংকুলান সমস্যা এবং সর্বোপরি শিক্ষকের বেতন সমস্যার সঙ্গে তাঁরা জড়িত । উপর থেকে কেউ কিছু করুন আর নাই করুন , দৈনন্দিন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এই সমস্যাগুলোকে সমাধান করতেই হয়। বহুকাল ধরে শুধু ছাত্র বেতনের উপর নির্ভর করেই এ দেশের স্কুলগুলি চলে এসেছে। অসংখ্য স্কুল গড়ে উঠেছে শুধু সমাজ কল্যাণকারীদের দানের উপর নির্ভর করে। শুধু স্কুল নয় , উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু চিরকাল তো এভাবে চলে না।" [২]

সমাজ সচেতন লেখকগণ এইসকল ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। যদিও প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক অন্দোলনের কথা কথাসাহিত্যে সেরকম আসেনি কিন্তু সমসামিয়ক ঘটনা পরম্পরায় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ এবং শিক্ষকদের অবস্থা নিয়ে কথাসাহিত্যিকগণ কলম ধরেছিলেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাজে যে আলোড়ন তুলেছিল তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন কাহিনী বয়নের মধ্য দিয়ে। এই কাল পর্বের ইতিহাসকে চিত্রিত করতে গিয়ে কোন কোন কথাসাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্যে শিক্ষককে নায়ক চরিত্রে রেখে প্রেক্ষাপটে রাখলেন ঔপনিবেশিক পর্বের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশজ শিক্ষার পরিণতিকে, কেউবা স্বাধীনতা অব্যবহিত পূর্ববর্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সমাজ, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাকে , আবার কেউ কেউ নকশাল আন্দোলনের মতো বিষয়কে।

ঔপনিবেশিক পর্বে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেখানে সংস্কৃত শিক্ষক হিসেবে পণ্ডিত মশাই এবং আরবি-ফারসি শিক্ষক হিসেবে মৌলভী সাহেব নিযুক্ত হতেন। বিদ্যালয়ে এই শিক্ষকদের দুর্গতি এবং সংকুচিত অবস্থানটিকে চিত্রিত করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪- ১৯৭৪) তাঁর 'পাদটীকা' গল্পে এবং সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) তাঁর 'বৈয়াকরণ' গল্পে। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যস্থায় অর্থনৈতিক কারণে 'চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে' যাবার ফলে দেশজ শিক্ষাধারা অবহেলিত হতে থাকে। দেশজ শিক্ষা ধারার করুণ পরিণতি এবং দেশজ পণ্ডিতদের চরম বঞ্চনার দিকটিকে লেখক তুলে ধরেছেন 'পাদটিকা' গল্পে। নিজ নিজ বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও স্কুলে এই সকল পণ্ডিত, মৌলভীদের অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকের তুলনায় এমনকি চাপরাশীর তুলনায়ও মাইনে ছিল কম। অর্থকৌলিন্যের দিক থেকে মর্যাদাহীন অনাদৃত এইসকল "পণ্ডিতশ্রেনী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেলেও যে কি রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-

সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।” সামান্যতম সম্মানটুকু পাবার জন্য তাঁরা চিরকালীন মেনে চলা ঐতিহ্য , সংস্কার পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দেন। সামান্য সম্মান প্রাপ্তির আশাতেই যে তাঁরা এমন আচরণ করতেন তা নয়, বাধ্যতামূলক কারণও ছিল এর পশ্চাতে। পরিবারকে প্রতিপালন করার জন্য ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিলনা তাঁদের। সেকারণেই চিরকাল ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধকারী পণ্ডিতকে স্কুল পরিদর্শনে আসা লাট সাহেবকে তুষ্ট করতে বাজার থেকে গেঞ্জি কিনে তা পরিধান করে ‘সার্কাসের সঙ’ সাজতে হয়। পরিবারের আটজন সদস্যের জীবনধারণের জন্য পঁচিশ টাকা বেতনভোগী পণ্ডিতকে লাট সাহেবের কুকুরের সঙ্গে তুলনা টেনে ছাত্রদের সম্মুখে তীব্র বেদনায় বলতে হয় “এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের ক’টা ঠ্যাঙের সমান?” কারণ লাট সাহেবের কুকুরের জন্য বরাদ্দ থাকে মাসে পঁচাত্তর টাকা। পরিহাসচ্ছলে উচ্চারিত এই আত্ম-অবমাননাকর বাক্যটির মধ্যে দিয়ে লেখক ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রদত্ত কর্তৃত্বপরায়ণ সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশজ শিক্ষকের নিদারুণ করুণ পরিণতিকেও প্রকাশ করেছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘বৈয়াকরণ’ গল্পেও দেখা যায় অনুরূপ চিত্র। মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির করুণ এবং ভয়াবহ রূপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল প্রাচীণ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষায় শিক্ষিতদের। সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক তুরন্ত পণ্ডিতকে প্রাণপ্রণ চেষ্টা করে সামান্য ইংরেজি শিখতে হয়েছিল ঔপনিবেশিক পর্বে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে টিকে থাকার জন্য । কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ছাত্রদের কাছে তাঁকে আরও হাস্যাস্পদ করে তুলেছিল। একই সারিতে দাঁড় করানো যায় নারায়ণ সান্যালের ‘পাষণ্ড পণ্ডিত’- এর প্রশান্ত পণ্ডিতকে কিংবা ‘চতুষ্পাঠী’ উপন্যাসের অনঙ্গপণ্ডিতকে। বিদ্যার প্রতি অনুরাগই ছিল প্রশান্ত পণ্ডিতের

জীবনপথের একমাত্র পাথেয়। মৃত পত্নীর অন্তিম ক্রিয়ায় গিয়ে শ্মশান বন্ধুদের উচ্চারণ শুধরে দেওয়া কিংবা নিজে মৃতপ্রায় অবস্থাতেও দুষ্কৃতীদের ভ্রম সংশোধন করে দেওয়া তাই তাঁর মতো পণ্ডিতের চোখে অস্বাভাবিক না ঠেকলেও সমাজের চোখে তিনি পাষণ্ডই। সদা শুচিতা পালনকারী এবং চতুষ্পাঠীর নিয়ম মান্যকারী শিক্ষকটিকেও তাঁর বেশ-ভূষা, আচার-আচরণ, ভাষাব্যবহার সমস্ত কিছুর জন্যই ছাত্রসহ সমগ্র সমাজের কাছে হাসির পাত্রে পরিণত হতে হয়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় কালকে প্রেক্ষাপট হিসেবে গ্রহণ করে লেখা শিক্ষক চরিত্র কেন্দ্রিক উপন্যাস গুলিতে যে যে সমস্যাগুলির প্রতি দৃকপাত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হল চাকরির বাজারের মন্দার প্রসঙ্গটি এবং সেই সঙ্গে চাকরি ঘিরে অরাজকতার প্রসঙ্গটিও। উপযুক্ত শিক্ষা এবং স্থিরীকৃত গুণাবলী পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র মেধাবী যুবকদের যে বেকারত্বের জ্বালায় জর্জরিত হতে হয়েছে তা এই সময়ের উপন্যাসের নায়কদের জীবন দিয়েই উপলব্ধি করা যায়। গজেন্দ্র মিত্রের (১৯০৮-১৯৯৪) 'রাত্রির তপস্যা'(১৯৫০) উপন্যাসের নায়ক শিক্ষক ভূপেনও তার থেকে ব্যাতিক্রমী নয়। ভূপেনকেও তার ছাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বলতে দেখা যায় " আমার তেমন কেউ জানাশুনো লোকও নেই যে , তদ্বির করে কোন কলেজে ঢুকিয়ে দেবে।" ঠিক একই সুর অনুরণিত হতে দেখা যায় 'অনুবর্তন' উপন্যাসের ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের সহশিক্ষক শরৎ বাবুর মুখে "অনেক চেষ্টা করেছি। হেন আফিস নেই যেখানে দরখাস্থ হাতে যাইনি। হেন লোক নেই যাকে ধরিনি। আমরা গরীব, নিজের লোক না থাকলে হয়না।" চাকরির এরূপ দুর্মূল্যের বাজারে সব দিক থেকেই মূল্যহীন ছিল শিক্ষকতার বৃত্তিটি। আর্থিক দিক থেকে দেখলে বলা যায় বাংলা দেশের ইস্কুল মাস্টারের বেতন অতি

সামান্য এবং সেই সামান্য পরিমাণ বেতনও নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং নির্দিষ্ট সময়ে পেতেন না শিক্ষকেরা। ভূপেন যে গ্রামের স্কুলের নিয়োগপত্র পেয়েছিল সে স্কুলের হেডমাস্টার নিয়োগপত্রের সাথে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে জানান যে " খাতায় কলমে পঞ্চাশ টাকা থাকিলেও আসল মাহিনা তাহার তেতাল্লিশ টাকা আট আনা।" সামাজিক দিক থেকেও শিক্ষকদের যে সম্মানীয় স্থান ছিলনা তার উল্লেখ পাওয়া যায় অবিনাশবাবুর কথাতেই "... এখানে ইস্কুল-মাস্টারদের লোকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না । মাস্টার শুনলেই সবাই মুখ টিপে হাসে – ঠাট্টা করে । আমাদের দেশে ফার্স্ট – ক্লাস লোক যারা তারা ব্যাবসা করে কিংবা সিভিলিয়ান বা উকিল-ব্যারিস্টার হয়, সেকেণ্ড –ক্লাস লোক হয় ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার , থার্ড-ক্লাস লোক চাকরি করে , ফোর্থ -ক্লাস লোক প্রফেসার হয় আর যাদের কিছু জোটে না তারাই যায় মাস্টারী করতে। ... আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে পাঁচ বছর কেরাণীগিরি আর তিন বছর মাস্টারী করলে মানুষ গাধা হয়।" [৩] 'মানুষ গড়ার কারিগর' উপন্যাসেও সতু ঘোষ মহিমকে শিক্ষকতা বৃত্তি সম্পর্কে এভাবেই সাবধান করে দিয়েছিল।

'রাত্রির তপস্যা' উপন্যাসের ভূপেন গ্রাম এবং শহর উভয় স্থানের স্কুলেই শিক্ষক রূপে কাজ করেছে। যদিও সে জীবন ধারণের উপায় হিসেবেই বেছে নিয়েছিল এ বৃত্তিকে কিন্তু শিক্ষকতা তার কাছে শুধু মাত্র পেশা ছিলনা , তা ছিল তার অন্তরের নেশা। এই বৃত্তিতে সে যোগদান করেছিল কতগুলি আদর্শকে সম্বল করে। সে বিশ্বাস করে শিক্ষার আদর্শ হল দেশ বা ভবিষ্যৎ জাতি গঠন করা। ভূপেনের এই শিক্ষকতার সূত্রেই লেখক পাঠকের সামনে উন্মোচন করেছেন সরকারের মদতপুষ্ট নিম্ন থেকে উচ্চ সর্বস্তরের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলিকে। শিক্ষক হিসেবে ভূপেন দেখেছে ছাত্র বা শিক্ষক কারো

সামনেই শিক্ষার কোন আদর্শ নেই। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশ করে চাকরি পাওয়া এবং শিক্ষকের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশ করিয়ে নিজেদের চাকরি রাখা। এর পরেই লেখক অবতারণা করেছেন শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় সে প্রসঙ্গটিকে।

শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির গতানুগতিকতা, শিক্ষার্থীদের অমনোযোগিতা , প্রধান শিক্ষক সহ স্কুল পরিচালন সমিতির অসহযোগিতা, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে অসাধুতা সব কিছু মিলিয়ে এক অরাজক পরিবেশ তৈরি হয়েছে সমগ্র শিক্ষাজগতে। নিম্নস্তরের শিক্ষালয় গুলির অবস্থা সংকটময়। শিক্ষকদের মানও উন্নত নয়। এমনকি শিক্ষার প্রচলিত স্বীকৃত মাপকাঠিকে পূরণ করতেও তাঁরা অক্ষম। ফলে ' অসহায় শিশুর দল ভুলে –ভরা অর্থ-পুস্তক মুখস্থ' করে পরীক্ষায় পাশ করে। গ্রামই হোক বা শহর -- উচ্চ স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রও একই। শিক্ষকদের ' ক্লাসে মন দিয়া পড়াইবার অবসর' একেবারেই নেই। সকলেই ব্যাস্ত টিউশনি , পাঠ্যপুস্তকরচনা এবং নানান বিধ কারণে। প্রথম সাক্ষাতেই সহকর্মীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতেও পিছু হটেন না। পড়ানোর পদ্ধতিতেও পারম্পর্যতার অভাব । পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনেও মাস্টারমশাইরা দায়িত্বে থাকলে নিজেরা নিজেদের বই ধরানোর চেষ্টা করে। ক্যানভাসারদের সাথে চুক্তি করে বই-এর অনুমোদন দেন মাস্টারমশাইরা এবং উপরি পাওনার জন্য ক্যানভাসারদের কাছ থেকে পাওয়া বই বিক্রি করে দেন। আবার অনেক সময় স্কুল মেম্বার যারা দীর্ঘদিন স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী নন তাঁরাই নির্বাচন করেন। এসব ক্ষেত্রে যাঁরা সারা বছর ধরে ছেলে পড়ান সেই সমস্ত শিক্ষকদের বিবেচনাকেও প্রাধান্য দেওয়া হয় না।

গ্রামীণ স্কুলে ছাত্রদের পাঠদানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে ভূপেনের সাথে সেক্রেটারির বাদানুবাদ চলে। শিক্ষক হিসেবে ভূপেন মনে করে গল্পের মাধ্যমে, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে পাঠদানই উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সেকারণে সে তার প্রথম ছাত্রী সন্ধ্যা কে যেমন বাড়িতে পড়াতে গিয়ে সাহিত্য বা ইতিহাসের পাঠ দেবার সময় সংশ্লিষ্ট পাঠের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন দেশ –বিদেশের গল্প বলত ঠিক তেমনি তার প্রথম স্কুলের ছাত্রদের পড়ানোর সময়ও সে একই পন্থা অবলম্বন করতো। এই পর্বের শিক্ষককেন্দ্রিক গল্পে শিক্ষকতার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের সংকীর্ণ চিন্তাধারার স্পর্শ থেকে বাঁচার জন্য নদীর ধারে কলুষমুক্ত পরিবেশে বিকেলের দিকে সে গল্পচ্ছলে বৈকালিক ভ্রমণের সময় পাঠ দিত প্রিয় ছাত্রদের। এই পদ্ধতি যে সুফলদায়ক তার প্রমাণও ঔপন্যাসিক দিয়েছেন "এ বেড়ানোর মধ্যে ভ্রমণ বা ব্যায়ামটা বড় কথা নয় – পড়ানোটাই আসল। সে এই সময় স্কুলের পড়া বাদ দিয়া যতটা সম্ভব মুখে মুখে বাহিরের জগতের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিত। দেশ-বিদেশের কথা, নানা জাতির ইতিহাস , ভাল ভাল বইয়ের গল্প , জননায়ক ও সাহিত্যিকের জীবনী, বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী – অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের সব বিভাগই তাহাদের গল্পের মধ্যে আলোচিত হইত। প্রথম প্রথম এ সমস্ত কথা উহারা শুধু অবাক হইয়া শুনিত , প্রশ্ন করিতে পারিত না । ... ক্রমে একটু করিয়া বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিলে তাহারা সাহস করিয়া প্রশ্ন করিতে শুরু করিল , তাহাদের কৌতূহল ভরসা পাইয়া নূতন জগতে প্রবেশের পথ খুঁজিতে লাগিল।" [৪] অর্থাৎ, গল্পচ্ছলে পাঠদান বিরক্তি উৎপাদক নয় বরং কৌতূহলোদ্দীপক। তাই সন্ধ্যার দাদু মোহিতবাবু ভূপেনকে সমর্থন করেন "পড়া বলতে শুধু নীরস পাঠ্য পুস্তক পড়াকে বোঝায় না, গল্পও যে পড়া হতে পারে আমাদের দেশের

অনেকেই তা বোঝে না।" কিন্তু ফলপ্রসু হলেও এ বিধি নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হতে থাকে প্রাচীনপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে।

উপরিউক্ত পদ্ধতি ছাড়াও ভূপেন এবং সন্ধ্যা মনে করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নত করতে গেলে

১) শিক্ষক-ছাত্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা দরকার। এতে ছাত্রের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

২) বাঁধা সিলেবাস নয় বরং যাতে সত্যকার শিক্ষা হয় ,জ্ঞানের আকাঙ্খা বাড়ে সেই চেষ্টায় মূল উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন।

৩) শিক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে হবে তাঁদের যাঁদের কাছে মাস্টারিটা পেশা নয় – নেশা। বৃত্তির খাতিরে নয় বরং 'মাস্টারী না করিয়া থাকিতে পারেন না' বলেই মাস্টারি করবেন সেরকম মানুষই উপযুক্ত।

উপন্যাসে বর্ণিত চৌধুরী বাবুর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়টি রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শে গড়ে ওঠা শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানটির কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক- ছাত্র উভয়ের প্রসঙ্গই সমভাবে বিবেচিত হয়েছে। ছাত্রদের বৌদ্ধিক , শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ ঘটে তার অনুরূপ শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এখানে। শিক্ষকদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটিও গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেছেন চৌধুরিবাবু। এমনকি সন্ধ্যা-ভূপেনের শিক্ষাচিন্তাতেও রবীন্দ্র শিক্ষদর্শনের প্রভাব পড়তে দেখা যায় ।

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক শিক্ষক-ছাত্রীর অপরিণত প্রণয় সম্পর্ক দেখিয়েছেন। এই প্রণয় সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন গুরু-শিষ্য প্রণয় সম্পর্কে বাধা আছে শুধুমাত্র সংস্কারের দিক থেকে। সন্ধ্যা এবং ভূপেনের পারস্পরিক আকর্ষণকে অনুভব করার পর ভূপেন উপলব্ধি করে "বাপ-মা যেমন আত্মজদের মধ্যে নিজেদেরই দেখেন , তেমনি দেখেন গুরু তাঁহার মেধা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে নিজের আত্মাকেই। যা নিজের সৃষ্টি , যাহার মধ্যে নিজের মনন ও কল্পনা প্রতিফলিত হয়, তাঁহার প্রতি আকর্ষণ উগ্র হওয়ায় স্বাভাবিক। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় , যেখানে সম্পর্কগত কোন বাধা নাই , যেটুকু আছে শুধুই সংস্কারগত – সেখানে যদি আকর্ষণটা যৌন –সম্পর্কে পরিণত হয় ত ঠেকাইবে কে?" [৫]

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকজীবনের এক পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র মনোজ বসুর 'মানুষ গড়ার কারিগর'(১৯৬০) উপন্যাসটি। উপন্যাসের নায়ক মহিমারঞ্জন ভূপেনের মতো সুমহান কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতী ইনস্টিট্যুউশনের শিক্ষকতা বৃত্তিতে যোগদান করেননি। অঙ্কে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাওয়া মহিম ক্রম মন্দীভূত চাকরীর বাজারে ঘটনাচক্রে রাজনৈতিক নেতার দাক্ষিণ্যে স্কুল শিক্ষকের পদটি লাভ করে। ইতিহাসের সূর্যকান্ত মাস্টারমশাইের আদর্শে বেড়ে ওঠা আলতাপোতা গ্রামের মহিম শিক্ষক রূপে স্কুলের কাজে যোগ দেবার সময় এই ধারণাই পোষণ করতো যে শিক্ষক শ্রেণীই সমাজে সুনাগরিক সরবরাহ করার মতো 'মহৎ কাজের ভার নিয়েছেন'। কিন্তু স্কুলের কাজে নিযুক্ত হবার পরেই তার এই ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে থাকে। মহিমের চোখে পড়তে থাকে শিক্ষকদের একের পর এক নগণ্য চিত্র। ভারতী স্কুলের শিক্ষক করালী বাবু বলেছেন " বাইরে থেকে লোকে জানে , বড্ড সাদাসিদে গোবেচারা মাস্টার আমরা –

ভিতরে ঢুকলে হরেক মজা দেখবে।” স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুদার থেকে সাধুতা , সত্যনিষ্ঠতা , দেশের প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জনের মন্ত্র শেখা মহিম একসময় অসাধু সতু ঘোষের কাজে ইস্তফা দেয় এবং শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। টাকার জন্য মনুষ্যত্ব না বেচার সংকল্প সে নিয়ে নিয়েছিল। অথচ শেষপর্যন্ত সে এই শিক্ষকতা বৃত্তিকে মহৎ বা সম্মানীয় বৃত্তি হিসেবে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি এবং সেও বাকি টিচারদের মতো স্কুল নামক কারখানার মিস্ত্রী বা কারিগরে পরিণত হয়। লেখক মনোজ বসু নিপুণ দক্ষতায় বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থায় কিভাবে একজন শিক্ষক শিল্পী বা স্রষ্টা না হয়ে মিস্ত্রী বা কারিগরে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন সেই চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘ভবিষ্যতের ভার’ গল্পটি । ‘মানুষ জাতটাকে গড়ে তোলবার ভার’ নিয়ে আত্মীয় স্বজনদের কটাক্ষ সত্ত্বেও একদা তরুণ হেডমাস্টার প্রবেশ করেছিলেন পবিত্র শিক্ষা অঙ্গনে । কিন্তু অচিরেই তিনি উপলব্ধি করেন , ছাত্রদের মানুষ করে তোলবার দায়িত্ব যারা নিয়েছেন তাদের হৃদয় কতখানি সংকীর্ণ । এক অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত মন নিয়ে পণ্ডিতের দল শিক্ষকতা করছেন । অতচ পরিবেশ পরিস্থিতি এই তরুণ হেডমাস্টারকেও একই স্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়। একদিকে চরমতম দারিদ্র্য , অন্যদিকে নিষ্প্রাণ-অন্ধকারময় পরিবেশ তাঁকেও করে তোলে নির্জীব । অবশেষে, তাঁর প্রাণবন্ত মনটির অবসান ধ্বনিত হয় যখন তিনি পাঠদানকালে নিজেকে নিদ্রিত অবস্থায় আবিষ্কার করেন । একজন শিক্ষকের কারিগরে পরিণত হবার জন্য যে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর দায়ও কিছু কম থাকে না তা এই উপন্যাস পাঠে অনুধাবন করা যায়। শিক্ষক সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনোভঙ্গীর প্রসঙ্গটিকে লেখক কিভাবে দেখিয়েছেন তার প্রতি আলোকপাত করা যাক।

১) অসাধু ব্যাবসায়ী সাতু ঘোষ মনে করেন শিক্ষকতার কাজ করলে গাধা হয়ে যেতে হয়। মহিমকে সাতু ঘোষ "ব্যঙ্গের সুরে বলেন, পারবে না, উপোস করে মরবে। ইস্কুল মাস্টারি হল তোমার কাজ - মানুষ গড়ার মহাব্রত। বারো বছর যে কাজ করলে গাধা হয়ে যায়।"

২) স্কুলের সেক্রেটারির বাড়ির চাকরেরা ভারতী ইনস্টিটিউশনের সকলকে চিনে রেখেছে। "মানুষ বলে ধরে না এঁদের।"

৩) ছাত্রের অভিভাবকেরা মনে করেন 'রাতের কুটুম' বা চোর। প্রশ্নপত্র "কিন্তু রাতের কুটুম চুপিসারে এসে ওই যে কোন বুদ্ধি খাটিয়ে সরে পড়তেন , তাতেই সর্বনাশ হয়ে গেল। ন'মাসের মাইনে তো নিয়েই নিয়েছেন – আমার এতগুলো টাকা বরবাদ।"

৪) কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার কাছে বেকার যুবকের সামাজিক মূল্য শিক্ষকের তুলনায় বেশী। মহিমের বিবাহের সম্বন্ধ আনা তারকবাবু মহিমকে জানান "... কিন্তু ফেঁসে গেল। ইস্কুল-মাস্টারকে মেয়ে দেবে না। কারণ মেয়ে তো শত্তুর নয়।" তিনি উপদেশ দেন পরের সম্বন্ধটার সময় "বরঞ্চ বলো বেকার হয়ে ঘুরছি।"

অর্থাৎ, সমাজ থেকে কর্মজীবনে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা কখনোই দেওয়া হয়নি। সমাজিক মানুষই এই অনীহাকে জাগ্রত করে রেখেছে। বাস্তবে যখন এরূপ ধ্যানধারণা পোষণ করা হচ্ছে শিক্ষকদের সম্পর্কে ঠিক এর পাশাপাশি একটা মহত্ত্বের রং চড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা। রাজনৈতিক নেতা প্রভাত পালিত মহিমকে বলেন "শিক্ষাবৃত্তির মতো পুণ্যকর্ম নেই। দেশের কাজও বটে। দেশের ভাবী নাগরিকদের উপযুক্ত রূপে গড়ে তোলা – এর চেয়ে দায়িত্বের ব্যাপার আর কি হতে পারে? জজ- ম্যাজিস্ট্রেট বল, মিনিস্টার বল, এমন কি গবর্নর বল, শিক্ষকের মতো সম্মান

কারো নেই।" যিনি এই বক্তব্যটি পেশ করেন ভারতী ইনস্টিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত সেই প্রেসিডেন্ট তাঁর কর্তব্য সমাধা করেন বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কয়েক মুহূর্তের জন্য উপস্থিত থেকে অন্যের লিখে দেওয়া বক্তৃতা পাঠ করে।

আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শিক্ষক সম্পর্কে সামাজিকের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের ত্রুটিপূর্ণ স্বভাবের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। স্কুলের শ্রেণীকক্ষকে শিক্ষকেরা করে তুলেছিলেন বিশ্রামাগার। ছাত্রের উন্নয়নের প্রতি কোন মনোযোগ তাঁদের ছিলনা, বরং উপার্জনের অন্য পন্থা খুঁজতেই তাঁরা আগ্রহী ছিলেন । শিক্ষকদের স্বভাবটিকে তুলে ধরা যাক।

১)" রামকিঙ্কর সহসা সদয় হয়ে বললেন, লিখে ফেল ওটা আগাগোড়া। লেখায় আসল। ... টেবিলের উপর পা আগেই তোলা ছিল, অতঃপর রামকিকঙ্কর চোখ বুজলেন। ক্ষণে ক্ষণে নাসার ধ্বনি। আবার সামলে নিচ্ছেন। ইতিহাস লেখা বন্ধ করে ছেলেরা কাটাকাটি খেলা শুরু করেছে। প্রয়োজনে পড়ে নানা রকম নিঃশব্দ খেলার আবিষ্কার করেছে। ... এ-ওর পেন্সিল কেড়ে নিচ্ছে, বই ছুঁড়ে দিচ্ছে – বলের মতো লুফে নিচ্ছে আবার। চিমটি কাটছে পরস্পর। জায়গা বদলাবদলি করে এর কাছ থেকে ওর কাছে গিয়ে বসছে।" [৬]

২) করালী বলেন, সে কি মশায় , মাস্টারি লাইনে এলেন , গুপ্ত অধ্যাপনা জানেন না ? ওই তো আসল । ইংরেজিতে যাকে বলে প্রাইভেট টুইশান।

৩) ছাত্রদের পরীক্ষার শ দুয়েক খাতা সলিল বাবু একদিনে দেখে শেষ করেন । ভুল ধরিয়ে দিলে নির্মম ভাবে ভয় দেখিয়ে ন্যায্য প্রাপ্ত নাম্বারকে কমিয়ে খাতা ফেরত দেন।

স্কুল এবং স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য বিদ্যাদান। কিন্তু সে উদ্দেশ্য থেকে অবনমন ঘটে শিক্ষালয় ক্রমশ ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কাল থেকেই শিক্ষাব্যবস্থায় এ চিত্রটির আগমন ঘটেছে। শিক্ষকও ছাত্রকে অসৎ উপায়ে পাস করিয়ে দেবার যেমন চেষ্টা করেন , তেমনই ছাত্ররাও পরীক্ষায় পাস করতে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করতে পিছুপা হয়না ।

১) কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে ইস্কুল। পাকাপোক্ত সরকার-জানিত ইস্কুল; তা ছাড়া ব্যাবসাদারি ইস্কুল অনেক – কোন ঝানু ব্যক্তি একটি বাড়ি ভাড়া করে সদ্য কলেজ ফেরত ছোঁড়াদের মাস্টার করে নিয়ে ইস্কুল চালায়। বইয়ে থাওয়ার ব্যাপারে বাড়ি ভাড়া দেয় ইস্কুলের ছুটি দিয়ে। ভাল রোজগার এই ইস্কুলের ব্যাবসায়ে। [৭]

২) শুধু কি পড়িয়েই পাশ হয় ভাই ? নতুন আপনি জানেন না। সেইজন্য চেক। চেক মানে হল এক টুকরো কাগজে লেখা ছাত্রের ক্লাস আর রোল-নম্বর স্পষ্টাস্পষ্টি বললে খারাপ শোনায়, বাইরের লোকের কানে পড়ে যেতে পারে – সে জন্য চেক নাম দিয়ে কাজকর্ম চলে। টুকরো টুকরো এমনি কাগজ অনেক আসবে , আমরা তাই নোটবুকে সঙ্গে সঙ্গে টুকে রাখি। খাতা দেখবার সময় নম্বরগুলো পাশে রেখে বিবেচনা করতে হয়। বিবেচনা কি ছাই- পাশ করিয়ে দেবেন , ভাল নম্বর দেবেন। [৮]

৪) গার্ড দিচ্ছেন মহিম। সঙ্গে পতাকীচরণ আছে। ... ঘুরে ঘুরে পাহাড়া দিয়ে বেড়ান; এই পেট মোটা কেন – বি-টি আছে নাকি রে? শার্টটা তোল দিকি উঁচু করে। ব্লটিং পেপার টানাটানি করবি নে। ... কাঁচা কালির উপর ব্লটিং চাপিস, ব্লটিন-এর উপর লেখা উল্টো

হয়ে ছাপ পড়ে যাচ্ছে।অরে কাশী , বাঁ হাত চিত করে অত কি লিখিস? ... হাতের তলা ভরতি করে কপিঙ-পেন্সিলে কত সব লিখে এনেছে। [৯]

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এরূপ দুর্দশা এবং শিক্ষকদের নিম্ন রুচির জন্য দায়ভার সামাজিক চাপিয়ে দিয়েছেন শিক্ষকদের উপরে। কিন্তু এ দায় শুধুমাত্র শিক্ষকের নয় বরং সমষ্টির। এই প্রসঙ্গটিকে লেখক উত্থাপন করিয়েছেন শিক্ষক দাশুর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে-- “গালিগালাজ করছেন। উচিত বটে! কিন্তু দোষ কি শুধুই আমাদের ? ইস্কুলের কর্তাদের নয় – তিরিশ টাকায় গ্র্যাজুয়েট রেখে যারা দেমাক করেন ? বিশ টাকা আন্ডার – গ্র্যাজুয়েটের মাইনে। মাস্টারদের ন্যায্য মাইনে বাড়ানো কি ইস্কুলের হিত সম্বন্ধে দুটো আলাপ-আলোচনা – এর জন্য একটা মিটিং ডাকার যাঁদের সময় হয় না। শিক্ষিত মানুষ প্রথম যখন আসেন, মনের মধ্যে বড় বড় আদর্শ মরে দুদিনে ভূত হয়ে যায়। দোষ গার্জেনেরও – বেশি টাকায় ইস্কুলের মাস্টার রেখে যারা ভাবেন কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। ছেলে কি করছে তার খোঁজ নেবেন না ; এগজামিনের রেজাল্ট বেরোলে তখন কৈফিয়ৎ চান ছেলের কাছে নয় – মাস্টারের কাছে। ছেলের সামনেই মাস্টারের উপর হুমকি ছাড়েন।” [১০]

‘রাত্রির তপস্যা’ উপন্যাসের মতন শিক্ষক-ছাত্রীর অপরিণত প্রণয় সম্পর্কের চিত্র দেখা যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮- ১৯৭০) ‘নির্জন শিখর’ উপন্যাসটিতেও। ‘নির্জন শিখর’ ছাড়াও শিক্ষকদের জীবনকে নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ‘ভাঙাচশমা’, ‘নির্জন শিখর’, ‘দাম’ প্রভৃতি তারই নিদর্শন। এই কাহিনীগুলিতে লেখক আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন বঙ্গীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত সুচিস্নাত আদর্শবাদী শিক্ষক চরিত্রের এক বিশ্বস্ত মানবিক মূর্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর কালের পটভূমিকায় রচিত লেখকের ‘ভাঙ্গাচশমা’ গল্পটিতে একজন আদর্শবান হেডমাস্টারের ছবি দেখতে পাওয়া যায় যিনি নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়টি বাঁচানোর তাগিদে মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলেন। আধপেটা খেয়ে জীবনের সবটুকু সম্বল উজাড় করে দিয়ে স্কুল তৈরি করেছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভিক্ষ তাঁর সে স্বপ্নকে কেড়ে নেয়। যুদ্ধের বাজারে যেখানে একদল স্বার্থবাজ মানুষ কালোবাজারে মুনাফা লুটতে ব্যস্ত সেখানে মানুষ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা হেডমাস্টার ভেঙ্গে পড়া ফাঁকা ক্লাসরুমে অদৃশ্য ছাত্রদের দরদ ভরা কণ্ঠ দিয়ে পড়িয়ে যান নির্ভুল ইংরেজির পাঠ। হেডমাস্টারের ভাঙাচশমার জ্বলজ্বলে দৃষ্টির সামনে ভেঙ্গে পড়েন আদর্শভ্রষ্ট কথক শিক্ষক। ‘মৃত বাংলার প্রেতমূর্তি স্বরূপ’ গ্রামের মাইনর স্কুলের এই অপ্রকৃতিস্থ হেডমাস্টারকে দেখে আত্মধিকার করে ওঠেন গল্পকথক যিনি শিক্ষকের চাকরি ত্যাগ করে অধিক বেতনের লোভে এবং প্রভুত্বের লোভে দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামে রিলিফ ওয়ার্কের জন্য সাব ডেপুটি অফিসারের কাজ নেয়।

‘নির্জন শিখর’ উপন্যাসে দর্শনের আদর্শবাদী শিক্ষক দেবনাথ ভট্টাচার্য প্রত্যক্ষ করেন ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের নির্লজ্জ এবং স্বার্থান্ধ হয়ে লিপ্ত হবার উন্মুক্ত রূপটিকে। দেবনাথ সমগ্র জীবন আদর্শকে সম্বল করে জীবনে পথ চলার চেষ্টা করেছিলেন। এই আদর্শের বীজ তাঁর মধ্যে বপন করেছিলেন তাঁর স্কুলের হেডমাস্টার, কলেজের অধ্যাপক মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ন্যায় আদর্শপরায়ণ শিক্ষকগণ। এই শিক্ষকদের সাহচর্যই কথককে শিক্ষক হবার অনুপ্রেরণা যোগায়। পুত্র বারীনের দ্বারা তাঁর এই আদর্শ বারবার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। দেবনাথেরই কলেজে যোগদান করে গভর্নিং বডির ইলেকশনে পিতার বিরুদ্ধে নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী বারীন বিপরীত

দলের প্রার্থী রূপে লড়াই করেন । অথচ দেবনাথ বেদনার্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করেন সেই বারীনই অধ্যাপনার জীবন পরিত্যাগ করে বেশী বেতনের এল আই সির চাকরি গ্রহণ করে এবং চাকরির শর্ত হিসেবে স্বেচ্ছায় গৃহীত দীর্ঘদিনের আচারিত মতাদর্শকেও জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধাবোধ করেনা।

'দাম' গল্পের কথক শিক্ষক চরিত্রটিও পরবর্তী প্রজন্মের এই লজ্জাকর দিকটি উপলব্ধি করেছেন। নিজেকে ঘিরেই তাঁর এই উপলব্ধি। মাসিক পত্রিকায় গল্পের যোগান দিতে গিয়ে গল্পের কথক তাঁর শৈশবের অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের পাঠদানের পদ্ধতিকে নীতিবাচক ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। গল্পের সহায়তায় পাঠককূলের কাছে মাস্টারমশাইকে পরিচয় করানোর সময় মাস্টারমশাইয়ের শাসনের আড়ালে ছাত্রের প্রতি যে অপার্থিব, অকৃত্রিম , অপরিমেয় স্নেহধারা বহমান থাকে এবং ছাত্রকে গড়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বিরাজমান থাকে তা কথক দেখাতে পারেননি। গল্পকার হিসেবে অহমিকার বশবর্তী হয়ে তা তিনি সেসময় উপলব্ধি করতেও পারেননি। পরবর্তীকালে অধ্যাপক হয়ে মফস্বলের কলেজে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাস্টারমশায়ের মুখোমুখি হয়ে কথক দেখেতে পান পরম মমতায় অতি যত্ন সহকারে ভালোবাসা দিয়ে রক্ষা করে চলেছেন মাস্টারমশায় তাঁর ছাত্রের সেই অতিরঞ্জিত গল্প। কথকের কাছে তখন উন্মোচিত হয় শিক্ষকের অন্য আরেক স্বরূপ 'স্নেহ –মমতা-ক্ষমার এক মহাসমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। সেই স্নেহ – কোটি মণি-মাণিক্য দিয়ে যার পরিমাপ হয় না ; সেই মমতা – যার দাম সংসারের সব ঐশ্বর্যের চাইতে বেশি; সেই ক্ষমা – কুবেরের ভাণ্ডারকে ধার দিয়েও যা পাওয়া যায়না।' [১১] আত্মদগ্ধ কথকের মনে হয়েছে সে অমূল্য সম্পদকে তিনি বিক্রী করে দিয়েছেন অর্থের বিনিময়ে।

‘ভাঙা চশমা’ কিংবা ‘দাম’ গল্পে কথকদের আত্মধিক্কারের মধ্যে দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন একসময় শিক্ষকতা বৃত্তিটির সঙ্গে স্বপ্ন এবং আদর্শবোধ জড়িয়ে ছিল।

বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের অসাধারণ রূপকার হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। নিপুণভাবে যেন “তিনি এই সমাজের ভাঁজের পর ভাজ খুলে পাটে পাটে চিনেছেন , জেনেছেন তার বিচিত্র অলিগলি , অন্ধিসন্ধি ।... নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই আপাতমলিন জীবনকে যেন দোরোখা নক্সীকাঁথার মতো সুচারু ফোঁড় তুলে সামনে এঁকে দিয়েছেন। প্রথমে চিত্রের বহুমাত্রিক বর্ণাঢ্যতায় আমরা চমকে উঠি , যেমন সরল , ঋজু তার মোটিভ তেমনি গভীর রহস্যময় তার ইশারা। ... গতানুগতিকতার ছন্দে কথন শুরু হচ্ছে , তারপর ধীরে ধীরে পাঠকের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে জীবনের আশ্চর্য কোনো বাঁক , মানবচরিত্রের অজানা কোনো দিক দপ দপ করে উঠছে।” [১২] বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিক্ষক চরিত্র কেন্দ্রিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘হেডমাস্টার’(১৩৫৬) এবং ‘হেডমিসস্ট্রেস’ গল্প দুটি সম্পর্কেই বিশ্লেষকের এ মন্তব্য প্রযোজ্য।

সামাজিক মানুষের মূলত দুটি দিক থাকে । একটি ব্যক্তিগত এবং অপরটি হল তার বৃত্তিগত দিক। শিক্ষকতা বৃত্তিটির সাথে যুক্ত ব্যক্তির সাধারণত বৃত্তিগত পরিচয়ের তলায় চাপা পড়ে যায় তাঁর ব্যক্তিগত সত্তাটি। কিন্তু ‘হেডমাস্টার’ গল্পের কথক নিরূপম নন্দী যখন তার নিজের ছোটবেলার স্কুলের শিক্ষক সম্পর্কে বলেন “কথায় কথায় এম ই স্কুলের হেডমাস্টারের জীবনের আর এক গোপন অধ্যায় আমার কাছে উদঘাটিত হল” তখন তার এই মন্তব্যে পাঠককূলও যেন সচেতন হয়ে পড়ে । শিক্ষক যে একজন সামাজিক মানুষ , শুধুমাত্র বৃত্তিগত জীবন ছাড়াও যে তাঁর আশা- আকাঙ্খা, স্বপ্নপূরণের অভিলাষময় একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে তা যেন এক লহমায় লেখক বোঝাতে চাইলেন এখানে। ১৯৫৩

সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি যুগান্তর পত্রিকায় শিক্ষকদের অবহেলিত ব্যাক্তিগত জীবন টিকেই যেন মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন পত্রিকার সম্পাদক - ...পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-সমাজ এমন একটা অসম্ভব কিছু দাবী করিতেছেন না । ...আমাদের শিক্ষকবর্গ যে প্রাচীন তপোবন আশ্রমের কুলপতি নন , তাঁহারা যে জটাবল্কলে থাকিয়া ও দিনান্তে একমুষ্টি আতপান্নে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করিয়া অবিরাম শুধু আগম , পুরাণ , ছন্দ , অলঙ্কার ও দর্শন ব্যাখ্যা করেননা , তাঁহারাও যে আমাদেরি মতো সমাজবদ্ধ মানুষ এবং তাঁহাদিগকেও যে ছেলের শিক্ষা , মেয়ের বিবাহ, রোগের চিকিৎসা , সব কিছুর ব্যয়ই সমানভাবে বহন করিতে হয় , এ কথা চিৎকার করিয়া বুঝাইতে হইতেছে , ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? [১৩]

সাগরপুর এম ই স্কুলের হেডমাস্টার কালীপ্রসন্ন সরকারের হেডমাস্টার পদটির প্রতি গভীর মমতার সাথে সাথে অধিকার বোধ ছিল প্রবল এবং সেটুকু রক্ষা করার জন্য পাশের গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ের টিচারের কাজের সুযোগ , নিজের স্কুলকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করার সুবিধা কোনটাই তিনি গ্রহণ করেননি। সেই শিক্ষক কে যাতে ‘স্ত্রী-পুত্রসহ এই বুড়োবয়সে না খেয়ে’ মরতে হয় তার জন্য নতুন শহরে এসে যখন চাকরির চেষ্টা করেন তখন তিনি দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাঁর ছাত্রকে জানান মাস্টারি ছাড়া যে কোন কাজ এমনকি কেরানিগিরি, কুলিগিরি পর্যন্ত তিনি করবেন। “কিন্তু মাস্টারি আর নয়। সাতাশ বছর ধরে মাস্টারি করার সুখ তো দেখলাম।”

কিন্তু কেন এই সুতীব্র অভিমান এবং সে অভিমান থেকে জাত অনীহা ? এই কারণ বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক তুলে আনলেন সমকালীন সময় , পরিবেশ , রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে। কারণগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

১)পাকিস্তানের হুজুগে গাঁয়ের বেশীরভাগ হিন্দু ছাত্র চলে আসায় স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় দশ আনি কমে গেছে । বাকি ছয় আনির মধ্যে মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছাত্রের কাছ থেকে নিয়মিত মাইনে আদায় হয় না।

২) একমাত্র সরকারি সাহায্য পঞ্চাশ টাকা ভরসা। এম ই স্কুলের পাঁচজন মাস্টারের মধ্যে সেটা বাঁটোয়ারা হয়।

৩) জেলা শহরের ইনস্পেক্টর স্কুল পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেন স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অনুসারে এর বেশী সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়।

৪) সেকেণ্ড মাস্টারমশায়ের মাস্টারি ছাড়াও মাতুল সম্পত্তি আছে , থার্ড মাস্টারমশাইর আছে মুদী দোকান , হেডপণ্ডিতের আছে উপার্জনক্ষম দুই ছেলে , সেকেণ্ড পণ্ডিত শ্রীবিলাস চক্রবর্তীর যজমানি আর গুরুগিরি কিন্তু হেডমাস্টামশাইয়ের সম্বল ছিলেন স্কুল সেক্রেটারির বাড়ির টিউশন কিন্তু তারাও দেশ ছাড়ে । তিনি হয়ে পড়েন নিঃসহায়। এদিকে পোষ্যের সংখ্যা কম নয়।

গল্পের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় মাস্টারমশায় তাঁর নব ছাত্রদল অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিম্নশ্রেণীর কর্মী যে শ্রেণী যেকোন কর্মক্ষেত্রেরই ভিত তাঁদের তিনি শেখাচ্ছেন স্বাধীনতা শব্দের অর্থ। স্বাধীনতার কারণেই একজন পঞ্চাশোর্ধ শিক্ষককে ভিটেমাটি , প্রিয় পেশা সবকিছু ছেড়ে আশ্রয় এবং নতুন জীবিকার জন্য ভিক্ষা প্রার্থী হতে হয় নতুন পরিবেশে।

একসময়ের ছাত্র বর্তমানে ব্যাঙ্ক কর্মী নিরূপম নন্দীর বদ্যানতায় ব্যাঙ্কে করণিকের চাকরি জুটে গেলেও দেশান্তরী আজীবন শিক্ষকতায় নিযুক্ত মানুষটি নতুন সমাজের নতুন পেশার

মূল্যবোধের সঙ্গে অভিযোজিত করতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন না। শিক্ষকতা বৃত্তির দায়িত্ববোধ , নৈতিকতার ধারণা, সম্ভাবনাময় ছাত্রদের দিশা দেখানোর আনন্দ – দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে লালিত এই চারিত্রিক অভ্যেসগুলি কালীপ্রসন্নের মজ্জাগত হয়ে গেছে। তাই ছাত্র নিরূপমের বাজে ইংরেজি হাতের লেখা আর গ্রামারের ভুলগুলিকে যেমন ধরে ধরে শুধরেছেন ঠিক তেমনি ভাবে অফিসের ভুলগুলিকেও শুধরোতে থাকেন। চাকরির অবস্থা সংকটময় জেনেও , এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে ক্রমাগত বদলি হতে হতেও কিন্তু তিনি তাঁর এই হেডমাস্টারির স্বভাব পরিত্যাগ করতে পারেননি।

দেশভাগ ,উদ্বাস্তু সমস্যা সাগরপুর গ্রামের বোতামহীন জামার মাস্টারমশায়কে পরিপাটি বেশভূষার নাগরিক করণিকে পরিণত করেছে ঠিকই কিন্তু বেদনার অন্তরালে সুপ্ত থাকা শিক্ষকতা বৃত্তির ঐকান্তিক অভিলাষকেই যেন ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘চতুষ্পাঠী’ উপন্যাসটির প্রকাশ কাল ১৯৯৫। খাদ্য আন্দোলনকে পটভূমিকায় রেখে তিনি রচনা করেন এই উপন্যাস। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এক সংস্কৃত পণ্ডিত যিনি ‘বিদ্যা বিক্রি করতেন না’ , প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর বেঁচে থাকার লড়াই এই কাহিনীর বিষয়। স্বাধীনতা পরবর্তী খাদ্য আন্দোলনের সময়কালে উদ্বাস্তুদের জীবনের সমস্যাকে রূপায়িত করার পাশাপাশি একসময়ের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাধারা এবং গৌরবান্বিত সংস্কৃত ভাষা কিভাবে সামাজিক মূল্য হারিয়ে কালগর্ভে বিলীন হয়ে যাছে তার একটা ঐতিহাসিক কাহিনীও বুনেছেন লেখক তাঁর এই প্রথম উপন্যাসে। চতুষ্পাঠীর শিক্ষায় শিক্ষিত সংস্কৃতসেবী অধ্যাপক অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠী ঘরানাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা এবং তার ফলে তাঁর যে জীবনযন্ত্রণা তাকেই দেখিয়েছেন লেখক এখানে। লেখক উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন, ‘পরবর্তীকালে বাঁচার জন্য অধ্যাপক বামুনেরা অনেকেই

নিজেদের সততা বিসর্জন দিয়ে ঐসব ফুঁ সর্বস্ব হয়েছিলেন। আমি আমার প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী'তে এরকম এক অধ্যাপক বামুনের সংকটের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম।" [১৪]

অনঙ্গমোহনের পিতা নীলকমল বিদ্যালংকার ছিলেন চতুষ্পাঠীর নিয়মনিষ্ঠ খ্যাতনামা অধ্যাপক। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় যখন সংস্কৃত কলেজকে ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রচেষ্টা করছিলেন তখন তিনিই সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকের মাধ্যমে আবেদন লিখে চট্টলের সংস্কৃত কলেজটিকে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি মনে করতেন সংস্কৃত শিক্ষা এবং সংস্কৃতিই প্রকৃত শিক্ষা। মেকলে প্রবর্তিত ঐ ম্লেচ্ছ শিক্ষাব্যবস্থায় অনাবশ্যক পাশ্চাত্য অনুরাগ জন্মে। ইংরাজের হীন অনুকৃত কিছু কুষ্মাণ্ড তৈরি হয়।" [১৫] তাই নিজের সন্তানকে তিনি সংস্কৃত ভাষাতেই শিক্ষা প্রদান করেন। নীলকমল বিশ্বাস করতেন স্কুলের মাস্টারি করা মানে বিদ্যাবিক্রয় করা তাই "স্কুল মাস্টারাঃ শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ" অথচ তাঁকেই আবার তাঁর নাতি জগদীশের স্কুলের পণ্ডিতের পদের জন্য সুপারিশ করতে হয়। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ঔপনিবেশিক শিক্ষার জালেরও বিস্তার হয়েছে সমাজে। তাই নীলকমল প্রায়শ্চিত্ত করে মুক্তি পেলেও অনঙ্গমোহনকে মুখোমুখি হতে হয় কঠোর সমাজবাস্তবতার সঙ্গে। নীলকমলের অধ্যাপনার কালে প্রতি জেলায় একটি বা দুটি করে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও কিন্তু গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর জন্য চতুষ্পাঠীর সংখ্যাই ছিল অধিক। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে , আট মাইল দূরবর্তী ঔপনিবেশিক ইংরাজি স্কুল ক্রমশ স্থান সঙ্কোচন ঘটিয়ে দুমাইল দূরত্বে চলে এসেছে এবং সেখানে কায়স্থ , বৈদ্যদের সাথে সাথে ব্রাহ্মণেরাও শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হয়েছে। এসেছে স্বাধীনতা , ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে দেশভাগ। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশভাগের ফলে

অত্যাচারিত ছিন্নমূল বেসরকারি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক আশ্রয় গ্রহণ করেছে এ বঙ্গে। সেসময় কলকাতায় তার আশ্রয় কোনরকমে জুটলেও খাদ্য সংস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রশাসনের অক্ষমতা। জীবিকার জন্য শিক্ষাগত দিক থেকে যে যোগ্যতাকে মান্যতা দেওয়ার সূত্রপাত করেছিল স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ শাসক তার অন্ধ অনুকরণ এবং অন্ধ অনুসরণ করে চলেছিল স্বাধীন ভারতের প্রশাসকগনও । এই শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন মেকলে এবং "মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজি জানাটা বড়ই আবশ্যিক। কিন্তু অনঙ্গমোহন ইংরাজি জানেন না। ইংরাজি শিক্ষা তিনি নেননি।" আর "ইংরাজি ইস্কুলে না পড়লে ডেপুটি সাব-ডেপুটি হওয়া যায় না। এমনকি কেরানিও হওয়া সম্ভব না। ... হাইস্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতদের ইংরেজি জানা চাই।" এমতাবস্থায় জগদীশের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সামান্য হলেও ইংরেজি জানা স্কুলের শিক্ষাই অনঙ্গমোহনদের অনাহার থেকে বাঁচিয়ে রাখে। ম্যাট্রিক পাশ না করতে পারলেও ইংরেজির দৌলতেই জগদীশ ম্যানেজারির কাজ পেয়ে যায়। অন্যদিকে সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ , দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও ইংরেজি না জানার ফলে অনঙ্গমোহনকে নির্ভর করে থাকতে হয় সরকারি দয়ার ওপরে, "তার নাম আবার ডি এ ,... দুর্মূল্য ভাতা সর্বক্ষেত্রে মূল বেতনের সঙ্গে দেয়। আমাগর বেতন নাই , অথচ ডি এ, এই ডি এ – টুকু পাইতে গেলে তো চতুষ্পাঠী চালাইতেই হয়।" সরকারি এই বৃত্তিটুকু পাবার জন্য সরকার নির্ধারিত নিয়মাবলী পূরণ করতে হয়। চতুষ্পাঠীতে 'কম কইর‍্যা পাঁচজন ছাত্র তো রাখতেই হয়। পরীক্ষায় বসাইতে হয়।' এই পাঁচজন ছাত্র জোগাড় করতেও হিমসিম খেতে হয় তাকে, আশ্রয় নিতে হয় ছলনার। কারণ বর্তমান শিক্ষার্থীরাও মনে করে অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য "ফালতু ফালতু টোলে ভর্তি হয়ে কী লাভ ? টাইম লস। বরং অংক করলে কাজ দেবে।" অর্থাৎ , ঔপনিবেশিক শিক্ষাপদ্ধতির

বিধিব্যবস্থার দরুন শিক্ষাক্ষেত্রে তখন সংস্কৃত ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক কারণে দীর্ঘদিনের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যখন মূল্য হারিয়ে ফেলতে থাকে তখন সেই শিক্ষাধারায় শিক্ষিত পণ্ডিতদের অবস্থা কী রূপ ধারণ করতে পারে অনঙ্গমোহনদের মতো পণ্ডিতকে দেখলেই তা অনুমান করা যায়।

উপন্যাসে সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যা তার জানা নেই বলে অনঙ্গমোহনকে বারংবার অসহায়ভাবে খেদ প্রকাশ করতে দেখা যায়। অথচ এই ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগও কম নেই , কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে তিনি উপলব্ধি করেছেন "পরিবর্তনশীল জগতের যোগ্য হও। নচেৎ বাঁচব না।" কামাখ্যার কাছে তাই করুণ আকুতি " আসলে বড় অসহায় আমরা। সংস্কৃত ভিন্ন আর কিছুই জানি না আমরা। সংস্কৃত আমাগোর বৃদ্ধা মাতা । এই মা আর আমাগরে খাওয়াইতে পরাইতে পারে না। তবু আমরা তারে আঁকড়াইয়া ধইরা আছি। আমরা বস্তুবিদ্যা জানি না।" [১৬] এই আর্তিই প্রমাণ করে যে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সে অপারক।

বিনিময় মূল্যহীন এই শিক্ষা – সংস্কৃতিতে শিক্ষিত অনঙ্গমোহন কিন্তু দিনের পর দিন অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়েও আদর্শচ্যুত হননি। প্রাক ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আদর্শের অনুসরণ ছিল এবং সেই শিক্ষাধারায় তা মেনে চলার প্রয়াসও ছিল। চতুষ্পাঠীর নিয়মানুসারে সংসারের দরিদ্রতা সত্ত্বেও সে আশ্রমিক হিসেবে রেখেছে অসীমকে। আবার এই অসীম যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে দ্বিধান্বিত চিত্তে বারংবার পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছেন চতুষ্পাঠী থেকে নাম বাদ দেবার প্রসঙ্গটি। সে জানে চতুষ্পাঠীর শিক্ষা অবৈতনিক। তাই সে কামখ্যার সামনে প্রশ্ন তোলে "কি কইরা পয়সা নিয়া ছাত্র পড়াই কও ? চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকরা তো পয়সা নিয়া পড়াইত না।" [১৭] এরূপ আদর্শবান মানুষের

সামনেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী দেখায় সরকারি টাকা লুটেপুটে নেবার পন্থা। এ চিত্রটির উপস্থাপনে কোথাও যেন ঔপন্যাসিক ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার অন্ধ অনুসরণের অসারতাকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

সমকালের রাজনীতি , অর্থনীতি , সামাজিক সমস্যা , মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম , ক্ষমতাবানের শাসন ও শোষণ এবং মানবিকতা প্রভৃতিকে গল্পের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে তপোবিজয় ঘোষ সৃজন করেছেন তাঁর শিক্ষক কেন্দ্রীক গল্পগুলি। এই গল্প রচনাকালে সমসাময়িক সমাজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কর্ম জীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। কর্মজীবনে প্রথমে তিনি ছিলেন স্কুল শিক্ষক এবং পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপক হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন।

তপোবিজয় ঘোষ (১৯৩৭-১৯৯০) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ , সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা , দুর্ভিক্ষ , মন্বন্তর , দেশবিভাগ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। পরবর্তীকালে খাদ্য আন্দোলন , নকশালবাড়ি আন্দোলন, জরুরী অবস্থা প্রভৃতি ঘটনাকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এই কালপর্বের অন্যান্য কথাসাহিত্যিকের ন্যায় সমকাল সচেতন এই লেখকের কথাসাহিত্যেও জীবন পথে অতিক্রান্ত এসকল ঘটনার প্রভাব রয়েছে। শিক্ষক নায়ক কেন্দ্রীক 'জীবনদীপ' গল্পের মধ্যেই দেশের পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে নিখিল তপনকে বলেছেন " গত ক'বছর দেশ জুড়ে কি কাণ্ড হলো? একদিকে লুটপাট খুন ধর্ষণ রাহাজানি ; অন্যদিকে খড়িবাড়ি- নকশালবাড়ি। কথায় কথায় পুলিস, সি আর পি , কথায় কথায় গুলি!"

সমকাল সচেতন এই লেখক তাঁর গল্প সংকলন 'কালচেতনার গল্প' তে 'লেখকের কথা' অংশে লিখেছেন , " সমগ্র দেশ যখন একাধিক ক্ষুধা , ঘৃণা প্রতিবাদ ও ক্রোধের আগুনে

দাও দাও জ্বলছিল , আর অন্যদিকে বুলেটে বেয়নেটে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পথে প্রান্তরে অরণ্যে বন্দীশালায় অবিরাম রক্ত ঝরাচ্ছিল – তখন নিরাপদে গৃহকোণে বসে বাঁশি বাজায়নি! সেই আতঙ্কপাণ্ডুর সন্ত্রাসের অবস্থার মধ্যেই আমরা লেখক শিল্পীরা একদিকে গড়ে তুলেছি 'গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী' (১৯৭২), অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দর্শন অনুযায়ী সাধ্যমত চেষ্টা করেছি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সাহিত্যরচনার।" গল্প সংকলনে বিবৃত মন্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায় কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী গল্পকারের সমাজের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা এবং সাহিত্যিক আদর্শের প্রসঙ্গটি । এই আদর্শগত কারণেই তিনি তাঁর গল্পের নায়কদের সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামী চরিত্র রূপে অঙ্কতি করেছেন। শিক্ষক চরিত্র প্রধান 'জীবনদীপ'(১৯৭৬), 'কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ', 'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা', 'সীতানাথের বাজার'(১৩৭৫, শারদীয় 'চতুষ্কোণ') প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠ করলেই লেখকের এই উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরেও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন নাগরিকের জীবনের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আশ্বাস আদতে যে ভণ্ডামীর নামান্তর সেটাকেই তুলে ধরা হয়েছে 'জীবনদীপ' গল্পে। একজন শিক্ষকের পিষ্ট হওয়ার কাহিনী এটি। গল্পে দেখা যায় সুবোধ মাস্টার শারীরিক ভাবে মারা পরেছে ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে। কিন্তু কথক তপন জানেন ট্রাক নিমিত্ত মাত্র, সংসারের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে সুবোধ মাস্টারের মানসিক মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে। পুরনো আমলের আই এ পাস মাধব মাষ্টার কে অতিব কম বেতনের কারণে অচল হয়ে পড়া সংসারকে সচল রাখতে নানা রকম ফন্দি আঁটতে হয়। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বিতরণ করা যে শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য দেশের প্রশাসনের অবহেলার কারণে সেই শিক্ষকের কাছে মাস্টারি হয়ে পড়েছে গৌণ। ধানচালের দালালি থেকে শুরু করে

সদরের হাটতলায় মাছ, ডিম , কাঁচা আনাজপাতি চালান দিয়ে অর্জিত উপার্জনের সমস্ত সম্বলটুকু ‘হাঁ-করা সংসারের গর্ভে’ ঢেলে দিতে বাধ্য হওয়া সর্বশান্ত মাধব মাষ্টার শেষ পর্যন্ত বীমার দালালি পর্যন্ত করেছেন কারণ তিনি জানেন ‘হাঙ্গার নোজ নো ল’। শাসক দলের মদতেই দেশ জোড়া অনেক বড়ো ফাঁদে আটকে পড়ে আছে মাধব মাস্টারেরা। সেখানে পদে পদে মৃত্যর ছায়া । মৃত্যু ফাঁদ যেখানে কখনও ওষুধে ভেজাল নিয়ে , কখনো খাদ্যে বিষ হয়ে , কখনও খাঁকি পোষাকে রাইফেল হাতে নেমে আসে সেখানে ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে মাধবমাস্টারের নিহত হওয়ার ঘটনাও আরেকটি মৃত্যু ফাঁদেরই প্রকারান্তর। মাধবমাস্টারের সহকর্মী শিক্ষক তপনের তাই মনে হয়েছে “মাধবমাস্টারের অদৃশ্য খুনীদের খুঁজে বের করা চাই-ই...” ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গিরীনের উত্তরসূরী রূপেই যেন লেখক তপোবিজয় ঘোষ তপন , নিখিল প্রমুখকে এঁকেছেন। লক্ষণীয় কল্লোলীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ মার্কসীয় চেতনায় আস্থাশীল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘টিচার’ গল্পটি রচনা করেন ১৯৪৬ সালে। ‘জীবনদীপ’ গল্পের রচনাকাল ১৯৭৬। এই তিন দশকেও শিক্ষকশ্রেণীর আর্থিক দুর্দশার মোচন ঘটেনি। অর্থাৎ, স্বাধীনতা লাভের পরে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও , শাসক দলের পরিবর্তন ঘটলেও কিন্তু সামাজিক চেহারার বদল ঘটেনি।

সুস্থ সমাজ প্রতিস্থাপনের জন্য শিক্ষকশ্রেণীকে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী রূপে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন গল্পকার তা তাঁর ‘কালচেতনার গল্প’ –এ সংকলিত ‘একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা’ এবং ‘কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ’ এই দুই গল্পের প্রধান চরিত্র যথাক্রমে কলেজের অধ্যাপক এবং মফস্বলের ‘ ভবতারিনী বহুমুখী বিদ্যালয়ের’ শিক্ষক চরিত্র দুটিকে পর্যবেক্ষণ করলেও নজরে পড়ে।

নকশাল আন্দোলনের সময় যে উত্তপ্ত আবহাওয়া বিরাজ করছিল সমগ্র রাজ্যে তখন সেখানে গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষাপটে রচিত হয় 'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা' গল্পটি। প্রশাসনের মদতে এসময় পুলিশি নির্মমতা মাত্রা ছাড়া হয়ে পড়ে। শিক্ষাজগতে নেমে আসে অরাজকতা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে তঞ্চকতা। 'চুরি-চামারিযোগে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ' করার প্রবণতা বেড়ে গেছে। রাষ্ট্র পরিচালকেরা শিক্ষক এবং দুষ্কৃতীদের এক সরল রেখায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। লেখক তাই আক্ষেপ করে বলেছেন " আমি আহত বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখলাম, এখন এখানে , এই দেশে , পটাশ এবং আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, একই খাঁচার অধিবাসী !" এখানেই শেষ হয়নি শাসকদলের অত্যাচার। অকারণ সন্দেহের বশে প্রমাণ ছাড়াই থানায় নিয়ে গেছে পুলিস। অত্যাচারিত অধ্যাপক লেখকের "এখন লেখাটেখা সব মাথায় উঠেছে , চাকরি নিয়ে টানাটানি। গণতন্ত্রের মহিমায় অধিকন্তু হাজতবাস না হয়ে যায়" । প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় , **১৯৬১** সালে লেখক সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। কিন্তু কলেজের এই চাকরী তাঁকে হারাতে হয় কারণ এইসময় চীনের ভারত আক্রমণ কালে লেখক চীনকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু লেখক থেমে যাননি। সমাজ পরিবর্তনের সুর তুলেছেন।

এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় লেখক একজন অধ্যাপক হিসেবে নিজের সামাজিক কর্তব্য স্থির করেছেন " নিজের হাতে বোমা হয়তো কোনোদিন বানাতে পারবো না , কিন্তু মানুষের গল্পের মধ্যে বোমার আগুন এখন থেকে আমি ভরে দেবো"।

'কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ' গল্পে দেখতে পাওয়া যায় কুণ্ডবাবুদের ঢালাই করা শক্ত ভিতে ফাটল ধরানোর মতো শক্তি সেক্রেটারীর বাড়িতে বেগার খাটতে যেতে বাধ্য

হওয়া নবীন শিক্ষকের নেই কারণ তাঁর রক্তের মধ্যে রয়েছে 'মধ্যবিত্তের ভীরুতা ও সুবিধাবাদ'। শুধু নবীন নয় প্রবীণ শিক্ষকদেরও ছিল না। সমসাময়িক পরিস্থিতিতে চাকরির অনিশ্চয়তা অনটন ক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষিত যুবকদের যে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে এ গল্পের কথকের আত্মসমীক্ষায় তা ফুটে ওঠে। আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে মানুষের নূন্যতম সম্মানবোধটুকুকেও ছিন্নভিন্ন করে দিতে পিছুপা হননা কুণ্ডবাবুদের মতো মানুষদের। অথচ এরাই দেশসেবক। কথকের মনে হয়েছে এই অসহায়তার কাছে তাঁকে মাথা নোয়াতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই কারণ টাইগারসহ কুণ্ডবাবুদের যে ভূতনাথেরা খুন করবে, সামান্যতম অপরাধের কারণে সর্বসমক্ষে বিবস্ত্র করে দেওয়া মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে যারা পাথরের পর পাথর মেরে কুণ্ডবাবুর হিংস্র বিলেতি কুকুরের দাঁত ওপড়ানোর চেষ্টা করে , কুণ্ডবাবুর দেওয়ালে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে যারা ঘরে ঘরে বড় হচ্ছে তাদের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখবেন। শিক্ষক স্কুলের পরিসরে ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাদের যথাযথভাবে মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য । কথক এখানে শিক্ষক হিসেবে সেই ভূমিকাকেই পালন করতে চেয়েছেন বৃহত্তর ভাবে, স্কুলের গণ্ডি অতক্রম করে সমাজের বিপুল পরিসরের মধ্যে।

সতেরো বছর আগে অবসর গ্রহণ করা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সতীনাথের বৈকালিক ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সামান্য মুড়িটকুও যখন জোটেনি তখন অভিমানী ক্ষুধার্ত সতীনাথ সমস্ত বাজার ঘুরে একটার পর একটা আহার্য সামগ্রী দেখে মানসলোকে রস আস্বাদন করতে থাকেন সেগুলির। কারণ , অর্থের অভাবে ভোগের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও ভোগ করতে সে অক্ষম। অসম্ভব ক্ষিদের জ্বালা মেটাতে তখন শিক্ষক সীতানাথকে আশ্রয় নিতে হয় ছলনার। ক্ষুধার্ত সীতানাথ পরখ করার ছলে তিরস্কৃত হয়েও চিড়ের বস্তা থেকে কাঁচা

চিড়ে , ডালা থেকে গুড় ভেঙ্গে নিয়ে খেয়ে ফেলেন। অসহায় সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামকে, বঞ্চিত মানুষের জীবন-বেদনাকে বাস্তবায়িত করেছেন লেখক সীতানাথের মধ্যে দিয়ে।

নকশাল আন্দোলনকে পটভূমি করে ১৯৭৯ সালে শারদীয়া 'প্রমা' পত্রিকায় মহাশ্বেতা দেবীর 'মাস্টার সাব' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কলমকে হাতিয়ার করে নেওয়া লেখিকা বলেন 'সত্তরের দশকের অন্দোলন বিষয়ে আমার সমর্থন আমি কখনো অস্বীকার করিনি।' [১৮] এদেশে কৃষকদের অবস্থা ইংরেজ আমলে ছিল সঙ্গীন । জমিদারদের তত্ত্বাবধানে কৃষকদের খাজনা দিতে হত ফসলের অর্ধেক । এমতাবস্থায় তেভাগা আন্দোলনে কৃষকরা দাবী জানায় ফসলের দুই তৃতীয়াংশ আদায়ের । যদিও এই আন্দোলন সফল হয়নি , তবুও স্বাধীনতার পর এই আন্দোলনের সূত্র ধরেই কৃষকদের জন্য আসে নতুন কিছু আইন যেমন বর্গাদার আইন(১৯৫০), জমি অধিগ্রহণ আইন (১৯৫৩), ভূমি সংস্কার আইন (১৯৫৩) প্রভৃতি। এসকল আইন বাংলার কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন সেভাবে ঘটাতে পারেনি। এর ফলস্বরূপ ১৯৬৭ সালে জন্ম নেয় নকশাল আন্দোলন । এই আন্দোলনের সূচনা দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি অঞ্চলে। দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে নকশালবাড়ি , ফাঁসিদেওয়া , খড়িবাড়ি এলাকার ভূমিহীন শ্রেণীর মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয় । কৃষক কমিটির নেতৃত্বে ভূমিহীন রাজবংশী , ওঁরাও, মুণ্ডারা জমির দলিল ও সুদখোর মহাজনদের ঋণপত্র পুড়িয়ে দেয় । সর্বোপরি নিজেদের প্রাপ্য ও অধিকার ফিরে পাবার উদ্দেশ্যে চাষিরা জোতদারদের ফসল কেড়ে নিয়ে চাষিদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় । ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কৃষকদের সমাবেশে সশস্ত্র বিপ্লবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এই বিপ্লবের

উদ্দেশ্য ছিল ভূমিহীন কৃষকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং পুলিশের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা। নকশালবাড়ি হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রতীক। "নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যা খ্যাত, তার পিছনে আছে বহু কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস , বহু কৃষক ও আদিবাসী অভ্যুত্থানের ইতিহাস , স্বাধীন ভারতের আইনের নামে – গণতন্ত্রের মহিমার নামে নির্মম শোষণের ও অত্যাচারের ইতিহাস..." [১৯] এই শেষ না হওয়ার , অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখিকা প্রতিবাদী চরিত্ররূপে দাঁড় করালেন স্কুলের মাস্টারমশায় জগদীশ মাহাতোকে।

তাঁর মতে 'মাস্টার সাব' প্রকৃত অর্থে জীবনী উপন্যাস। ভোজপুরের জগদীশ মাহাতোর ঘটনাই হল মাস্টারসাব গল্পের বিষয়। সত্তরের দশকে অর্থাৎ নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময়কালে জগদীশ মাস্টার , ধনী মালিকদের দ্বারা হরিজন মেয়েদের যথেচ্ছ ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন, হরিজনদের জন্য 'হরিজনিস্তান' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। এরপর ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়েন বামপন্থী সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে। স্কুলের শিক্ষক জগদীশ মাহাতোই এই উপন্যাসের নায়ক।"ওদের ঘরের কোন ছেলেটা আরায় গিয়ে অতবড়ো ইস্কুলে মাস্টার হয়েছিল? ওই যে মাস্টার হল , তাতেই নাম হয়ে গেল মাস্টার সাব।" "গরিব কিষানের ছেলে হল মাস্টার"[২০] মনে পড়ে যায় 'সন্দীপন পাঠশালার' সদগোপের ছেলে সীতারামের শিক্ষক হবার প্রসঙ্গটি।

"গণ ও সমাজ জীবন আশ্রিত ইতিহাসচর্চায়" বিশ্বাসী লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর রচনার মূল উপাদান সংগ্রহ করেন ভারতবর্ষের জীবন্ত ইতিহাস থেকে। কারণ তিনি মনে করেন " ইতিহাসকে তো আমি গণবৃত্তে দাঁড়িয়েই দেখি। রাজবৃত্তের ইতিহাস লেখেন ঐতিহাসিক। আমি খুঁজি নাম নেই- ঠিকানা নেই সেই সব মানুষকে , যারা শোষণ সহ্য করতে করতে

একদিন বিদ্রোহ করে। হয়তো জেতে না ,মরেও যায়। তবু ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখি। কোন না কোন পরাজয় , জয়ের চেয়ে অনেক মহান হয়ে ওঠে । মাস্টার সাবের কাহিনীতে লোকবৃত্তের ভূমিকা আনতে চেয়েছি, জাতপাতের বিদ্বেষ আজও জীবন্ত, সে জন্যই গাথাগুলি লিখেছি। " [২১]

'আমি/আমার লেখা' নামক প্রবন্ধে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর রচিত সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন "লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাস করি।" [২২] সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যিনি সুনিশ্চিত , ঘটনা পরম্পরাকে তিনি নিখুঁত ভাবে অঙ্কন করবেন সেটাও সুনিশ্চিত। উপন্যাসের মুখ্য বিষয় জগদীশ মাহাতোর নিরন্ন , বুভুক্ষ মানুষের কাছে 'দেবতা' হয়ে ওঠার বীর গাথা প্রকাশ করা হলেও উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যেহেতু শিক্ষক অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার বিষয়ে সরকারি ঔদাসিন্যের প্রসঙ্গটিকে লেখিকা বাদ দেননি। গ্রামের সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যে অবহেলিত , পাঠের উপযুক্ত সরঞ্জাম থেকে তারা যে বঞ্চিত সে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকের অসহায়তার দিকটাও উল্লেখ করেছেন। জগুর মাস্টারজি সরকারের বুনিয়াদি স্কুলে পড়িয়ে যে মাইনে পেতেন তার অনেকটাই বেড়িয়ে যেত ছেলেদের বই শ্লেট কিনে দেবার জন্য। তিনি সরকারি স্কুলে পড়াবার সময়ে সরকারের কাছ থেকে যা পাবার কথা , ফ্রি বই, তা তিনি পেতেন না। শিক্ষকতা বৃত্তি এই মানুষটির কাছেও মহৎ কর্মই। তাই নিজের ছাত্রের শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণে উচ্ছল হয়ে বলেন, "আজ কি একটা সোজা দিন জগু? শিক্ষক হলে , কত সুযোগ পাবে ভালো ছাত্র গড়ার। ভালো ছাত্ররাই তো দেশের কাজে লাগবে।" [২৩] জগদীশ মাহাতোর শিক্ষক হওয়ার পথটা সুগম ছিলনা। কারণ একোয়ারী গ্রামের হরিজনদের সমাজে লেখাপড়া শেখটাও নির্ভর করে

সমাজের উচ্চশ্রেণীর জোতদারের দয়ার ওপরে। "এই ভীরুতা , এই বাধ্যতা নাথুনির খুব পছন্দ ছিল। সেই জন্যেই ওদের ছেলে হয়ে মাস্টার সাব যখন বালক বয়সে ইস্কুলে যায় , নাথুনি বলেছিল বেশ করেছিস। লেখাপড়া শেখ।" [২৪] কিন্তু ততদিনে জগু বুঝেছে , লেখাপড়া শিখলেও সে মালিকদের চোখে হরিজনই থাকবে। সেকারণেই সে স্বজনদের দুর্দশা মোচনে প্রস্তুতি নিতে থাকে। মাস্টার হবার পর সে প্রথম স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছ থেকে শাস্ত্র জেনে উদাহরণ সংগ্রহ করে দেখতে চেয়েছেন হরিজন নারীদের লাঞ্ছনার উপায়। এখান থেকেই মাস্টার সাবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে পথে নামা শুরু। দরিদ্র মানুষের পীড়ন সম্পর্কে সচেতন মাস্টারজী মুক্তির উপায় খুঁজতেন আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে। কিন্তু মাস্টারজীর শিক্ষায় বেড়ে ওঠা, মার্ক্সীয় ভাবধারার উজ্জীবিত জগদীশ উপলব্ধি করে শাস্ত্র নয় নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য অস্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন। সমাজের তীব্র সংকটকালীন সময়ে একজন দায়বদ্ধ শিক্ষকের কাছে সমগ্র সমাজ হয়ে ওঠে তাঁর কাছে বিদ্যালয় এবং সেই সমাজের পীড়িত মানুষ হয়ে ওঠে ছাত্র।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রকাশিত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষক কেন্দ্রীক কাহিনীগুলির আলোচনায় দেখা গেল এই কাল পর্বের কাহিনীগুলিতে সমসাময়িক সময়কালকে প্রেক্ষাপট করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষা নিয়ে মানুষের আশা ছিল তীব্র। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয়নি। তাই এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকে যে যে কাহিনী রচিত হয়েছে সেখানে শিক্ষাপদ্ধতি কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় সে প্রসঙ্গটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের দারিদ্র্য দশাকেও দেখিয়েছেন সাহিত্যিকগণ। উদ্বাস্তু ছিন্নমূল শিক্ষকগণ পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে জীবনধারণের জন্য শিক্ষকতা বৃত্তিকে পরিত্যাগ করেছেন ঠিকই কিন্তু শিক্ষক সত্তাটিকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হয়নি। ষাটের দশকের

পরবর্তীকালে রচিত কাহিনীতে কথাসাহিত্যিকগণ শিক্ষককে স্কুলের পরিসর অতিক্রম করিয়ে সমাজের বিশাল আয়তনে তাঁদের প্রতিস্থাপিত করিয়ে দিলেন সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদী রূপে।

উৎস ও তথ্য নির্দেশ

১) নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি(সম্পাঃ) ,সংগ্রাম আন্দোলনে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (১৯৩৫- ২০০৫) ১ম খণ্ড , কলকাতা, নেতাজি ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিস ও প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৭। পৃ- ১৪২

২) বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়). চিত্রিতা, 'সময়ের উপকরণঃ মেয়েদের স্মৃতিকথা' , কলকাতা, পুস্তক বিপণি , আগস্ট ২০০৪। পৃ-১৩৮

৩) মিত্র. গজেন্দ্র, 'রাত্রির তপস্যা' , কলকাতা , মিত্র ও ঘোষ, পৌষ ১৩৫৫, পৃ- ৪৩

৪) তদেব, পৃ -৭০

৫) তদেব, পৃ -১৬৪

৬) বসু. মনোজ, 'মানুষ গড়ার কারিগর', কলকাতা ,বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, মার্চ ১৯৬০। পৃ- ৩৭

৭) তদেব ,পৃ- ১০৭

৮) তদেব , পৃ-৭৫

৯) তদেব , পৃ-৭৯

১০) তদেব , পৃ- ৯৩

১১) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (সম্পাঃ), আচার্য কাহিনী , কলকাতা , বৈশাখ ১৪১১

১২) পুরকাইত. উত্তম (সম্পাঃ) , 'উজাগর', নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা , উজাগর প্রকাশন,উলুবেড়িয়া হাওড়া, পৃ- ২৬

১৩) নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি(সম্পা) ,সংগ্রাম আন্দোলনে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (১৯৩৫- ২০০৫) ১ম খণ্ড , কলকাতা, নেতাজি ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিস ও প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৭। পৃ- ১৪৩

১৪) ভৌমিক. তাপস (সম্প), 'কোরক', প্রাকশারদ সংখ্যা ১৪১৯ 'কোরক' পৃ- ১২

১৫) চক্রবর্তী. স্বপ্নময়, 'চতুষ্পাঠী', কলকাতা, দে'জ , ১৯৯৫। পৃ- ৩৬

১৬) তদেব ,পৃ-৭৭

১৭) তদেব, পৃ- ৭৮

১৮) গুপ্ত. অজয় (সম্পা) , 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র' (একাদশ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা, ২০০৩। পৃ- ৫৮৬

১৯) গোস্বামী. অর্জুন (সম্পা) , 'নকশালবাড়ির দিনগুলো' পৃ-২৯০

২০) তদেব, পৃ – ২৭

২১) তদেব, পৃ- ৫৮৭

২২) তদেব, পৃ – ৫১৮

২৩) তদেব, পৃ- ২৪

২৪) তদেব, পৃ- ২১

৬

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে নারী শিক্ষা জগৎ এবং শিক্ষিকা সমাজ

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের গতিপথের দিকে তাকালে দেখা যায় ভারতীয় শিক্ষার প্রামাণ্য নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে শিক্ষার যে বিবরণ পাওয়া যায় সেখানে নারীর তুলনায় পুরুষদের শিক্ষার প্রসঙ্গটি বেশি সুস্পষ্ট ঠিকই কিন্তু এটাও স্বীকার্য যে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই শিক্ষার নিদর্শন রয়েছে সেখানে। অর্থাৎ, সেসময় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন থাকলেও নারীদের জন্য আলাদা কোন শিক্ষালয় ছিল কিনা তার উল্লেখ অবশ্য পাওয়া যায়না। ব্রাহ্মণ , ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সমাজের এই তিন উচ্চ শ্রেণীর নারীদের বেদ অধ্যয়নের পূর্ণ অধিকার ছিল। [১] বিশাল বৈদিক সাহিত্যের সংহিতায় , ব্রাহ্মণে , উপনিষদে অনেক বিদূষীর নাম পরিলক্ষিত হয়।

ব্রহ্মবাদিনী এবং ব্রহ্মচারিণী – এই দুইপ্রকারের নারীর নাম পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। ব্রহ্মচারিণীগণ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করার পূর্বে পুরুষ ব্রহ্মচারীর মতো কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতেন বলে উল্লেখিত হয়েছে অথর্ববেদে (১১/৬) [২]। মহাভারতে শাণ্ডিল্য এবং গর্গের কন্যাগণকে ব্রহ্মচারিণী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ব্রহ্মচারিণীগণ ব্রহ্মচর্য পালন করার পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করতেন কিন্তু ব্রহ্মবাদিনীগণ আজীবন চিরকুমারী থাকতেন। বৈদিক দেবতা বিষয়ক গ্রন্থ ‘বৃহদ্দেবতা’য় বিশ্ববারা , রোমশা, লোপামুদ্রা , অম্ভৃণী বাক ,জুহু , পৌলমী , কাক্ষীবতী , ঘোষা , জরিতা প্রমুখ

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিনারীগনকে ব্রহ্মচারিণী রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এরূপ সাতাশ জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিনারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে 'বৃহদ্দেবতা'য়।

বৈদিক যুগে যে নারী অধ্যাপিকাও ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় পাণিনির সূত্রতেও। তিনি আচার্যা এবং আচার্যাণী , উপধ্যায়া এবং উপধ্যায়ানী এই দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তিমূলক সূত্র নির্ণয় করে শব্দ জোড়ার পার্থক্য দেখিয়েছেন। আচার্যা এবং উপধ্যায়া শব্দের অর্থ হল অধ্যাপিকা এবং আচার্যাণী , উপধ্যায়ানী এই শব্দগুলি গুরুপত্নী অর্থে ব্যবহৃত হয়। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে পাণিনি কৃত এই সূত্রগুলির ব্যাখা প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কয়েকজন অধ্যাপিকার নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি আপিশালা এবং ঔদমেধার নাম উল্লেখ করেছেন বিদুষী অধ্যাপিকা হিসেবে। যে নারী বৈয়াকরণ আপিশালিগোষ্ঠীর সৃষ্ট ব্যাকরণের একটি বিশেষ শাখা শিক্ষা করেছেন তিনি পরিচিত হতেন আপিশালা নামে।ঔদমেধী নামক আচার্যের নারী ছাত্রীদের বলা হতো ঔদমেদী।[৩]

বৈদিক যুগের বিদূষী ব্রহ্মবাদিনী নারীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা ছিলেন জ্ঞানী , বিদুষী, তপস্বিনী গার্গী। বৃহাদারণ্যক উপনিষদে বিবৃত হয়েছে যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গীর মধ্যে জনক রাজের রাজসভায় অনুষ্ঠিত বিতর্কের বিবরণ। সেই বিচার সভায় বিচার্য বিষয় ছিল – ব্রহ্মজ্ঞান , উপস্থিত ছিলেন বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত ঋষি এবং বিচার সভায় পুরষ্কার হিসেবে ছিল একশত গোধন। সে বিতর্ক শেষ পর্যন্ত চলেছিল যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গীর মধ্যে। এই বিতর্কে কারো জয় বা পরাজয় নির্ণীত হয়নি। তাঁদের দার্শনিক বিতর্ক থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে উভয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে।

এই উপনিষদের অপর আরেকটি আধ্যাত্মিক আলোচনা যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীর মধ্যে, প্রমাণ দেয় বৈদিক যুগের উন্নত নারীশিক্ষা ব্যবস্থার। যাজ্ঞবল্ক্য প্রবজ্যা গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে পার্থিব সম্পত্তি দুই স্ত্রী কাত্যায়নী এবং মৈত্রেয়ীর মধ্যে বন্টন করে দিতে চাইলে মৈত্রেয়ী তা প্রত্যাখ্যান করেন পার্থিব সম্পদ তাঁকে অমৃতত্ব বা ব্রহ্মপদ দিতে পারবে না বলে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর এই বানীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবাত্মার চিরন্তন অভীপ্সার কথা।

অগ্নিহোত্রী নামক একটি প্রাত্যহিক হোম সম্পাদনার সময়কে কেন্দ্র করে একবার বিদ্বান ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসা করার জন্য নামগোত্রহীন এবং কেবলমাত্র 'কুমারী' নামে উল্লেখিত বিদূষীর কাছে যান এবং তিনি সে সমস্যার সমাধানও করে দেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখিত এই প্রসঙ্গ থেকে এই ধারণা করা যেতে পারে যে সেই সময় পাণ্ডিত্যে , বৈদগ্ধ্যে কোন কোন বিদুষী নারী বৈদিক পুরুষ ঋষিকে অতিক্রম করে গেছেন।

বৈদিক যুগে কন্যা সন্তান কাঙ্খিত[৪] ছিল অথচ পরিবর্তিত সময়ে সামাজিক অনুশাসনের নাগপাশে নারী একসময় হয়ে উঠলেন কারো না কারো অনুগ্রহীতা। মনু তাঁর স্মৃতিতে বললেন –

"পিতা রক্ষতি কৌমরে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।

পুত্রশ্চ স্থাবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমইতি।।" (মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৪৬/১৪)

মহাভারতে নারীশিক্ষার যে বিবরণ পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় কন্যার অভিভাবকগণ স্বগৃহে শিক্ষক রেখে কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। অধ্যাপকগণ নিজ নিজ কন্যাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন। এই নিয়ম পরবর্তীকালেও কোন কোন অবিভাবক অনুসরণ করেছিলেন।

মুসলমান শাসনকালে মুসলমান মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলেও মেয়েরা ঘরেই কোরানের সুরা আবৃত্তি করতে শিখত । সম্ভ্রান্ত এবং রাজপরিবারের মহিলাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার সমাদর ছিল বলে মনে করা হয়। নূরজাহান সুশিক্ষিতা ছিলেন । শাহজাহানের কন্যা জাহানারার আত্মজীবনী বিখ্যাত গ্রন্থ । ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেব উন্নিসা বিদুষী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন । মুসলিম নারীরা মাদ্রাসা স্থাপন করে শিক্ষার মর্যাদা দিয়েছেন । আকবরের ধাত্রীমা মাহম অনগ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । মুসলিম সমাজে অবরোধ প্রথা যদিও কঠোর ছিল তবুও মেয়েরা মক্তবে সাত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত ।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেবের উদার এবং সাম্যবাদী ধর্মান্দোলনের প্রভাবে বহুমুখী সুপরিবর্তন আসে বঙ্গ সংস্কৃতিতে। মূলত এই ধর্মান্দোলনের প্রভাবে নারীশিক্ষার সচেতনতা প্রথম প্রবেশ করেছিল বৈষ্ণব সমাজে। বৈষ্ণবী মা গোঁসাইগণের অনেকেই ছিলেন শিক্ষিতা এবং তাঁরা অনেকেই বৈষ্ণব সমাজে 'আচার্যা'র পদ অধিগ্রহণ করতেন। উদাহরণ হিসেবে শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবী, জাহ্নবী দেবী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। মুসলমান আমলেও বৈষ্ণব সমাজে পর্দাপ্রথা না থাকায় শিক্ষায় নারী- পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণে কোনপ্রকার বাধা ছিলনা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেয়েদের

লেখাপড়া শেখানোর জন্য শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োজিত করা হতো এই সকল বৈষ্ণবীদের। [৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের অন্যতম দুই বিদূষী রমণী হলেন হটু বিদ্যালঙ্কার এবং হটী বিদ্যালঙ্কার। রাঢ় দেশের কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের বালবিধবা ছিলেন হটি বিদ্যালঙ্কার যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বারাণসীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং সেখানে অধ্যাপনাও শুরু করেন। হটি বিদ্যালঙ্কার ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। সংস্কৃত ব্যাকরণ , স্মৃতি , নব্য-ন্যায় কাব্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অপরিসীম। [৬]

রাঢ় দেশের ওপর একজন প্রসিদ্ধা পণ্ডিত হলেন হটু বিদ্যালঙ্কার। তাঁর আসল নাম রূপমঞ্জরী। পিতা নারায়ণ দাসের উৎসাহে তিনি চতুষ্পাঠীর শিক্ষালাভ করতে সমর্থ হন এবং ব্যাকরণ, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। চিরকুমারী, পুরুষবেশধারী ,মুণ্ডিত মস্তক, অর্কফলাধারী হটু বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে নানা স্থান থেকে বিদ্যার্থী তাঁর কাছে শিক্ষালাভের জন্য আসতো। [৭]

নারায়ণ সান্যাল তাঁর রূপমঞ্জরী উপন্যাসটিতে এই দুজন বিদুষী রমণীকে প্রধান চরিত্র রূপে উপস্থাপিত করেছেন। যদিও হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে তবু বাস্তবে দেখা যায় প্রাচীন আর মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে অনেকটাই উদাসীন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে , জমিদার ও অভিজাত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শেখবার প্রবণতা দেখা যায় । তবে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি সমাজে স্ত্রীশিক্ষা অনেকখানি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে । এর কারণ হিসেবে উঠে আসে বাল্যবিবাহের কথা । মেয়েদের এই সময়ে শিক্ষালাভের তুলনায় গৃহকর্মে

অনেক বেশী ব্যস্ত থাকতে হতো । তাছাড়াও , সমাজে পুরুষ প্রাধান্য বজায় রাখতে সমাজপতিরাও অতিমাত্রায় তৎপর ছিলেন । লেখাপড়া শিখে মেয়েরা যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং পুরুষ প্রাধান্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন – সে আশঙ্কা অনেকের মনেই দানা বেঁধেছিল । কাজেই নারীকে শিক্ষা হতে বঞ্চিত করতে , সমাজপতিরা , স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত নানান অলীক ও অবাস্তব ধারণা সমাজের মধ্যে গড়ে তোলেন । এইরকম পরিস্থিতি শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত দেখা যায় । সমাজের এক অংশ যখন মেয়েদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে উৎসাহী, ঠিক তখনই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু মানুষ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন । এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য রাধাকান্ত দেব , রামমোহন অনুরাগী প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ও খ্রিস্টান মিশনারিরা ।

উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের ব্যাপারে প্রথম মিশনারিরাই এগিয়ে আসেন । এরাই প্রথম এদেশে মেয়েদের স্কুল স্থাপন ও স্ত্রী শিক্ষা কর্মসূচী রূপায়নের জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান । কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা যায় যে, মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । তাদের উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার । এই কারণে ধীরে ধীরে মিশনারিদের তৈরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের সমর্থন কমে আসে । বাঙালি সমাজে পর্দা প্রথা তখনও উঠে না যাওয়ায় ভদ্র ঘরের মেয়েরা এইসব স্কুলে আসতে চাইতনা । সমাজের সর্বহারা , নিম্নশ্রেণীর পরিবারের মেয়েরা পড়তে আসতেন এইসমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে ।

এদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে যার অবদান সবথেকে বেশি তিনি হলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন । এদেশে এসে তিনি নারীকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন ভালোবেসে । নারীশিক্ষা ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে তিনি বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন । কিন্তু ধীরে ধীরে স্কুলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে । ইতিমধ্যে ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচে স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে বেথুন স্কুলে অর্থ সাহায্য করায় স্কুলের শোচনীয় অবস্থা দূর হয় ।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অতুলনীয়। অবহেলিত , অপমানিত নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের শিক্ষার মাধ্যমে আত্মসচেতন করে তোলা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। ১৮৪৯ সালে বেথুনের প্রচেষ্টায় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের জন্য যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যাসাগর সেখানে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে দেন স্কুলের উন্নতি প্রকল্পে। শুধু তাই নয় , স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বাংলা সরকারের মনোভাব বিদ্যাসাগরের কাছে সদর্থক মনে হওয়ায় বালকদের মডেল স্কুলের সাথে সাথে তিনি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনেও অগ্রসর হন। নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮ – এই অল্প সময়পর্বে তিনি স্থাপন করেন ৩৫ টি বালিকা-বিদ্যালয়। সরকার তখন সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে চিন্তিত। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য অর্থব্যয়ে উৎসাহ ছিল না তাদের। সেকারণে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এই বিদ্যালয়গুলির অর্থ সাহায্যের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সরকারি অসহযোগিতা , সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করার কারণে আর্থিক অনিশ্চয়তা- কোনটাই তাঁর বালিকা বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁকে নিরাশ করতে পারেনি। স্কুলগুলি পরিচালনার জন্য তিনি একটি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানও খোলেন ।

এছাড়াও উনিশ শতকে বিভিন্ন জায়গায় অনেক সহৃদয় ব্যক্তির উদ্যোগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো । কিন্তু সরকারি

ঔদাসীন্য , আর্থিক অনটন ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য এইসব স্কুলের অধিকাংশ বন্ধ হয়েছিলো । কিন্তু লেখাপড়া শেখার অধিকার যে মেয়েদের আছে আর তাতে যে কিছু ক্ষতি হয়না – এই বোধ জনসমাজে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল স্কুলগুলো ।

উনিশ শতকের ষাটের দশকে স্ত্রী শিক্ষার পদ্ধতি নিয়েও সমাজের বিভিন্ন স্তরে মতবিরোধ দেখা যায় । সব ধরণের শিক্ষা গ্রহণ করার মানসিক সামর্থ্য মেয়েদের আছে কিনা , তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয় । তবে এমন নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে ধীরে ধীরে মেয়েরা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও বসবার অধিকার লাভ করে । ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে তাদের শিক্ষার জগৎ । শতাব্দীর প্রথমার্ধে মেয়েদের শিক্ষার বিস্তার মোটামুটি বাঙালি হিন্দু ও ব্রাহ্মণ পরিবারে সীমাবদ্ধ থাকলেও , শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তা মুসলমান সমাজের মেয়েদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে ।

স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির পথে উনিশ শতকের শেষের দিকেও অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। কুসংস্কারের এই অন্তরায় দূর হতে আরো বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিলো। তবে এর মধ্যেও ১৮৭৮ সালের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে স্থির গতিতে হলেও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার লক্ষ্য করা যায়।

এবারে দেখা যাক কথাসাহিত্যে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ এবং শিক্ষিকা চরিত্র কেমনভাবে অঙ্কিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে শিক্ষিকা এসেছেন পার্শ্বচরিত্র হিসেবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথের ‘অপরিচিতা’র কল্যাণী , ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্য , বুদ্ধদেব বসুর ‘শোণপাংশু’ শ্রীমতির অধ্যাপিকা , সন্দীপন পাঠশালার মেয়েস্কুলের দিদিমণি কথা। লাবণ্য গৃহশিক্ষিকার কাজ শুরু করেছিলেন আত্মসম্মানের

সঙ্গে বাঁচার জন্য। কল্যানীও বিবাহসভায় অপমানিত হবার পর ব্রত নেয় অবিবাহিত থাকার এবং এর পরেই তাকে দেখা যায় মেয়েদের জন্য স্কুল চালাতে।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিয়ে এলেন ' হেডমিস্ট্রেস' গল্পটি যার প্রধান চরিত্র একজন শিক্ষিকা। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৭-১৯৭৫) 'হেডমিস্ট্রেস' (১৯৫০) গল্পে উদ্বাস্তু পরিবারের সংসার চালানোর জন্য প্রথাবদ্ধ সংস্কার ভেঙ্গে মেয়েদের জীবিকা অর্জনের জন্য ঘরের বাইরে বের হতে হয়েছিল তারই কথাকে তুলে ধরতে গিয়ে বিবৃত করেছেন শিক্ষিকাদের অভাব, অভিযোগ , কমিটির হৃদয়হীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গকে। এর সঙ্গে সঙ্গে শৈলেন সুপ্রীতির ব্যক্তিত্বের সংঘাত , নারী পুরুষের পৃথক সামাজিক অবস্থান , পারস্পরিক জৈব ঈর্ষা এই সকল প্রসঙ্গকেও চিত্রিত করেছেন। এখানে লেখক সেসময়ের নারীদের দ্বিমাত্রিক সংকটের প্রসঙ্গটিকে বিবেচ্য বিষয় করেছেন। সেসময়ে নারীদের একদিকে বাইরের জগতে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় নামতে হয়েছে আর অন্যদিকে গৃহাভ্যন্তরে পরিবারস্থ মানুষগুলির কাছে বিরাগভাজনও হতে হয়েছে নানা সময়ে। এই কারণে সুপ্রীতির পরিচয়ে পরিচিত হতে চায়নি শৈলেন কিন্তু মাসের শেষে পাওনাদারের টাকা মেটাতে হাত পাততে হয়েছে তাকে সুপ্রীতির কাছেই। মেয়েদের এই সদরে বেরোনতে দীর্ঘ দিনের অনেক অবরোধ , বহু বন্ধনের অবসান ঘটে। মেয়েরা পুরুষদের সাথে সাথে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। এতে মেয়ে স্কুলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। দেশ ভাগের পর প্রয়োজনের ধাক্কায় বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য স্কুল এবং কিছু কলেজ।[৮]শহরের ওপর গড়ে ওঠা এমনই এক স্কুলের হেডমিস্ট্রেস সুপ্রীতি।" সেই সঙ্গে অন্নসংস্থান হয়েছে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি পরিবারের। টিচারদের মধ্যে বেশীর ভাগই মাত্র ম্যাট্রিক পাশ। দু'তিনজন আণ্ডার ম্যাট্রিক আছেন । সেকেণ্ড টিচার

আই. এ । গ্র্যাজুয়েট শুধু হেডমিস্ট্রেস সুপ্রীতি। এই প্রতিযোগিতার বাজারে অন্য কোন হাই স্কুলে এদের চাকরি জোটা কঠিন হোত।" মেয়ে স্কুলগুলিকে খুব একটা সম্মান জনক নজরে দেখা হতো না। 'রাত্রির তপস্যা' উপন্যাসে দেখা যায় সন্ধ্যার দাদু মোহিতবাবু মেয়েদের স্কুলের পড়ানো নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না বলেই সন্ধ্যাকে মেয়ে স্কুলে ভর্তি করান নি এবং "মেয়ে-মাস্টারনীও ঠিক সেই কারণে" [৯] রাখেননি।

দুর্মূল্যের বাজারে এইসকল স্কুলে একজন শিক্ষিকার মাসিক বেতন ছিল একশো টাকা। তাও কয়েকমাসের বেতন বাকি থেকে যায়। পুজোর আগে কমিটি কিছু অর্থ ধরিয়ে দিলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল বড়ই অপ্রতুল। সেই টাকা থেকে বাকি শিক্ষিকাদের টাকা দিতে গিয়ে সুপ্রীতির ভাগেই রয়ে যায় মাত্র পাঁচ টাকা। এখানেও শিক্ষা প্রদানকারীদের প্রতি অবহেলার চিত্রই ফুটে উঠেছে। এই গল্পে শিক্ষাজগতের প্রসঙ্গ সেভাবে তুলে ধরা হয়নি । পরবর্তীকালে শিক্ষার প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে অঙ্কন করেছেন বানী বসু তাঁর গল্পে ।

বানী বসুর 'উত্তরসাধক' (১৯৯২) গল্পের প্রধান চরিত্র শিক্ষিকা মেধা মনে করে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত জটিল সমাজকে সুষ্ঠভাবে গড়ে তোলার জন্য কুশিক্ষাকে দূরীভুত করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজে এই কুশিক্ষাকে সুবিধাবাদী সম্প্রদায় যেমন রাজনৈতিক নেতারা তাদের ভোটের স্বার্থে, ব্যবসাদাররা তাদের মুনাফার স্বার্থে জিইয়ে রাখে। ইতিহাসবিদ অধ্যাপিকার মতে একমাত্র বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষাই পারে সমাজ থেকে এই কুশিক্ষাকে দূরীভূত করতে। সুশিক্ষার সাহায্যেই সামাজিক ব্যবস্থার চুড়ান্ত গলদ ঠিক করতে হবে। মেধা এই কাজে নেমে শিক্ষাকে হাতিয়ার করে। ইতিহাসের শিক্ষিকা মেধা মনে করেন ছোট থেকে মুক্ত হৃদয়ে এবং মুক্ত বুদ্ধিতে কর্ম , মানবিক

সম্পর্ক এবং জ্ঞানের চর্চা করা দরকার। সেই সঙ্গে আমাদের শিল্পবোধ জাগ্রত করতে হবে । নীতিবোধ সৌন্দর্যবোধ সহৃদয়তা খোলা মন – কর্মে প্রীতি এবং জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ এই সব মিলে একটা যথার্থ মানুষ তৈরি হয়। এই 'টোটাল হিউম্যান বিয়িং'- কে তৈরি করার জন্যই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, আমাদের সমাজ বিন্যাস। তাই সে চেষ্টা করে পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট্ট অবহেলিত , অনুন্নত, নিরন্ন গ্রামকে সঙ্ঘবদ্ধ ছাত্রশক্তি দিয়ে সমস্ত দিক থেকে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য।

কিন্তু বিদেশ থেকে ফিরে সে শিক্ষাজগতের আবহাওয়ায় একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখে। চিত্রটা খুব হতাশাজনক। ছাত্র – ছাত্রীদের ওপর থেকে সততা ও নীতির চাপটা একেবারে উঠে গেছে । তারা বিশৃঙ্খল , অরাজক। আরও ভয়াবহ চিত্র অধ্যাপক মহলের। তাঁদের বেশির ভাগই কোনও না কোনও দলীয় রাজনীতি করেন এবং পড়ানোর সময়ে সুকৌশলে রাজনীতি বক্তৃতায় ঢুকিয়ে দেন ।এর ওপর , তাঁদের ক্লাসে যাওয়াটাই একটা ব্যতিক্রম । একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল কলেজে পড়তে গিয়ে 'রাত্রির তপস্যা' উপন্যাসের শিক্ষক নায়ক ভূপেনের। অল্প বয়স্করা সব থিসিস , পেপার , এম ফিল করতে ব্যস্ত । নইলে তাঁদের ইনক্রিমেণ্ট হবে না । সরকারি কলেজে ছাত্রদরদ জিনিসটা চিরকালই কম। বদলি এবং প্রমোশন এই দুটো জিনিসই সাধারণত সেখানে বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে হলেও পঠন পাঠনের কাজটা চলত। অবশ্য মেধা কয়েকজন আন্তরিক স্বভাবের মানুষের পরিচয়ও পেয়েছেন। " ছাত্রদরদী না হোন , যে কাজের জন্য নিযুক্ত আছেন সেটা ভালোভাবে করা দরকার এটা তাঁরা মনে করেন।"

শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ত্রুটি চোখে পড়ে তার। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য কোচিং ক্লাসে যায় , সেখানে তারা নোট পায়, পরীক্ষাটা ছাত্রদের হয় না , হয় অধ্যাপক – টিউটরদের। এবং কোচিং ক্লাসগুলোর সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফলের কোথাও একটা সূক্ষ্ম অসাধু যোগাযোগ আছে।

ফলে স্কুল- কলেজের পড়াশোনা গুরুত্ব হারাতে থাকে। নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে বাড়ির টিউশনি শিক্ষার কিংবা কোচিং ক্লাসের শিক্ষার। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন এখনও ঘটেনি। প্রাইভেট টিউশানি , কোচিং ক্লাসের পড়াশোনা পদ্ধতির রমরমা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং এই ধরণের পড়াশোনার মূল্য কী সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন সুধীর চক্রবর্তী 'টিউশনি পড়া ' নামক প্রবন্ধে " ব্যাপারটা কী ? শিক্ষক কে? শিক্ষক কী ? শিক্ষকতার লক্ষ্য কী ? এবারকার উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হওয়া ছাত্রটি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে তার প্রাইভেট টিউটরদের। আসলে তাহলে কে প্রথম হয়েছে? একজন ছাত্র না একটা নেটওয়ার্ক ? নাকি প্যাকেজ? ... লেখাপড়াটাও এখন একরকম প্যাকেজ হয়ে উঠল নাকি?" [১০]

দেশের এই বেহাল অবস্থা পাল্টানোর শক্তি আছে ছাত্র- ছাত্রীর। কারণ ছাত্রশক্তিকে তিনি মনে করেছেন দেশের সংরক্ষিত শক্তিকূট । ছাত্রশক্তি যা করে সমস্ত অন্তর দিয়ে করে , সংগঠনের কাজ , সৃষ্টির কাজের দায়ভার ওদের ওপর তুলে দিলে জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে তারা তা বহন করবে।

কথাসাহিত্যে শিক্ষক চরিত্রের তুলনায় শিক্ষিকার চরিত্র অপ্রতুল। কথাসাহিত্যিকগণ শিক্ষিকা শ্রেণীর যে শিল্পীত রূপ অঙ্কন করেছেন সেখানে শিক্ষিকাগণের প্রতিবাদী সত্তার

পাশাপাশি তাঁদের সৃজণশীল গুণটির প্রতিও আলোকপাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘অপরিচিতা’র কল্যাণী , ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্য , নরেনন্দ্রনাথ মিত্রের ‘হেডমিস্ট্রেসে’র সুপ্রীতি, নারায়ণ সান্যালের ‘রূপমঞ্জরী’র হটি বিদ্যালঙ্কার , বানী বসুর ‘উত্তরসাধকে’র মেধা ভাটনগর এই একই ধারার পথ প্রদর্শক।

সমাজে বিকৃতমনস্ক মনোবৃত্তি, রাজনৈতিক অভিসন্ধি ,আর্থিক অনটন ,ক্ষমতার দম্ভ শিক্ষককে, শিক্ষাজগৎকে প্রভাবিত করলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মেলবন্ধন যে সেসমস্ত অসঙ্গতিকে দূরীভূত করে দিয়ে সুস্থ সুগঠিত সমাজ নির্মানের প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে, শিক্ষিকাকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে সেই প্রসঙ্গটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

উৎস ও তথ্য নির্দেশ

১) পাণিনি কৃত কঠী , কলাপী প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত সূত্র থেকে ধারণা করা যায় যে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। বেদের কঠ শাখায় সুপণ্ডিত নারী কে অবিহিত করা হয় কঠী নামে। কলাপ শাখার পাণ্ডিত্য অর্জনকারী নারী হলেন কলাপী এবং তাঁরা অধ্যাপনার কাজও করতে পারতেন। ডঃ যোগীরাজ বসু , ‘বেদের পরিচয়’ , কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো , ১লা বৈশাখ , ১৪২৩। পৃ- ২০২

২) তদেব , পৃ- ২০৫

৩) তদেব , পৃ- ২০৩

৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি অংশ থেকে জানা যায় বৈদিক যুগে পিতামাতা বিদ্বান পুত্রের কামনার পাশাপাশি বিদূষী কন্যার জন্মের জন্যও কামনা করতেন। যদি কেউ দীর্ঘায়ুযুক্তা বিদুষী কন্যা লাভ করতে চান তাহলে পিতামাতা কে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনা করার নির্দেশ দেওয়া আছে। (৬-৪-৮) পৃ -২০৪

৫) দত্ত. ডঃ জয়ীতা, 'সমকালের প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ' কলকাতা, পুস্তক বিপণী, মে ২০০০। পৃ- ৩০৪

৬) বন্দ্যোপাধ্যায়. ব্রজেন্দ্রনাথ (সম্পা) , 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' কলকাতা ,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ , বৈশাখ ১৩৫৮ । পৃ- ৭

৭) তদেব , পৃ- ৯

৮) বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়). চিত্রিতা, 'সময়ের উপকরণঃ মেয়েদের স্মৃতিকথা' , কলকাতা, পুস্তক বিপণি , আগস্ট ২০০৪, পৃ - ১৪০

৯) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (সম্পাঃ), 'আচার্য কাহিনী',কলকাতা, বৈশাখ ১৪১১, পৃ - ১৫৯

১০) চক্রবর্তী. সুধীর, 'লেখাপড়া করে যে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩ , পৃ-৮৪

৭
উপসংহার

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকের কথা প্রসঙ্গে প্রাচীন কালের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি এক সুতীব্র মোহ লক্ষ্য করা যায় । সেখানে সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্যান্য প্রসঙ্গ অনুল্লেখিত থেকে বেতনহীন পুণ্য কর্ম রূপে শিক্ষাদানের প্রসঙ্গটিই শিক্ষার মহিমাজ্ঞাপক প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। আবার গুরুভক্তির ক্ষেত্রে আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে প্রাচীন যুগের শিক্ষার্থীরাই উঠে আসে প্রথম সারিতে । কিন্তু এ সকল আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে ওঠে না তৎকালীন সামাজিক কাঠামোর দিকটি। সমাজের শাসনকর্তা রাজার অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল গুরুকুলের ব্যয়ভার বহন করা। অথচ শিক্ষা ছিল রাজনৈতিক অনুশাসন মুক্ত। জীবনজিজ্ঞাসা থেকে উদ্ভূত সে যুগের শিক্ষা গুরুর সান্নিধ্য ভিন্ন লাভ করা অসম্ভব ছিল বলে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিল অচ্ছেদ্য, পিতা-পুত্রের ন্যায়। অর্থনৈতিক লাভের প্রসঙ্গ শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ছিলনা । কিন্তু পরবর্তীতে সমাজ বিবর্তনের ধারায় সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা পদ্ধতিতে আসে পরিবর্তন , শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের অচ্ছেদ্য বন্ধনেও অন্য মাত্রা যোগ হয়।

ভারতবর্ষের মতো উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশে বিদেশী জাতির আগমন ঘটেছে বারে বারে, যার ফলে দেশের অন্তর্বর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পালাবদল ঘটেছে। বলাবাহুল্য সমাজ সম্পৃক্ত শিক্ষাব্যবস্থাও একটা ধারা থেকে আরেকটা ধারায় বাঁক নিয়েছে। এই সকল অনুপ্রবেশকারীদের শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে সংমিশ্রণ ঘটেছে দেশের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা- সংস্কৃতির। এতে সমকালীন সমাজ , সভ্যতা ও সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রমাণ স্বাধীনতা পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অবশ্য স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও দেশীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত সরকারের মধ্যেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীর সত্তর – আশির দশক পর্যন্ত আর্থিক অনটনে ক্লিষ্ট শিক্ষকদের অবস্থার পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ ছিলনা অথচ শিক্ষকতা বৃত্তিটির গায়ে ত্যাগের, মহত্ত্বের একটা তকমা লাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছিল অরাজকতা। শিক্ষা পরিণত হয়েছে ব্যাবসাতে । এই মনোভাব শিক্ষক , শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পরিচালন সমিতি সবার মধ্যেই কাজ করেছে ।

আলোচ্য গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় শিক্ষাব্যবস্থা একটা মিলিত সামাজিক প্রয়াস। উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা আবশ্যক। সেইসঙ্গে প্রয়োজন শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিবেশ। শিক্ষকতা বৃত্তিটির নিশ্চয়তাও থাকতে হবে। মানবিকবোধসম্পন্ন উদার ধৈর্যশীল মুক্তমনা শিক্ষককেও জ্ঞানচর্চার অভিলাষী হতে হবে। আর শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ শিক্ষার্থীকেও বিদ্যাভিলাষী হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মিলিত প্রয়াসই সৃজন করতে পারে উন্নত মানের সমাজ। ক্রম বিবর্তনের পথে শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষক- শিক্ষার্থীর সম্পর্ককেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কথাসাহিত্যে।

পরিশিষ্ট

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান রূপ

মকতব এবং মাদ্রাসার বর্তমান রূপ

সাক্ষাৎকার ১

তথ্যদাতার পরিচয়ঃ মহম্মদ গোলাম আনসারি

সহকারী শিক্ষক (আরবী) , এম এম এম এ (ইংরাজি),বি এড

কৃষ্ণপুর, ধুলিয়ান , মুর্শিদাবাদ

১) বর্তমানে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তার উদ্দেশ্য কি ?

- প্রাথমিক ধর্মীয় আচরণ পালনের মধ্যে দিয়ে মানবিকতার শিক্ষা প্রদান , চারিত্রিক উন্নয়ন , দেশপ্রেম , জাতীয়তাবোধের শিক্ষাদান এই মকতব , মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ।
- ইসলাম ধর্মের সংস্কৃতি , কৃষ্টি-র ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে মসজিদ কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মকতব স্থাপন করা হয় । মোটামুটি হাজার অধিবাসী সম্পন্ন গ্রামের দশ – বারোটি পরিবার মিলিয়ে একটি এজমা বা কমিটি গঠন করা হয় । এই কমিটির প্রধান হলেন সর্দার বা মোড়ল । সর্দারের নেতৃত্বেই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন , শিক্ষক নির্বাচন , রক্ষণা-বেক্ষণ করা হয় ।

২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ কেমন?

- সাধারণত সকালেই মকতব , মাদ্রাসা বসে ।
- মকতবে সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়।

- মাদ্রাসায় প্রাথমিক থেকে উচ্চ সকল স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে । সরকারি এবং বেসরকারি দুই প্রকার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে ।
- উলা , সামিয়া , সামেসা , রাবেয়া , দৌড়া (র‍্যাপিড রিডিং পারা)- এগুলি প্রাথমিক ক্লাসের শ্রেণীবিভাগের নাম ।
- আলিম (মাধ্যমিক),ফাজিল(উচ্চমাধ্যমিক),কালিম(স্নাতক), মুমতাজুল মুহাদ্দিসিন (স্নাতকোত্তর) – এরূপ নামেই অভিহিত করা হয় মধ্য এবং উচ্চশিক্ষার পর্যায়গুলিকে ।

৩) প্রাচীন ঐতিহ্যের শিক্ষা প্রকরণ , আদর্শের অনুসরণ বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে আছে কিনা ?

মকতব , মাদ্রাসায় কোরান পাঠের শিক্ষা দেওয়া হতো । ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলনের সেই ধারা বর্তমানেও অনুসৃত হয় । প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোরান শরিফ পাঠ এখন এই শিক্ষার অঙ্গ হয়ে আছে ।

৪) যুগের চাহিদাগত কারণে প্রদেয় শিক্ষায় নতুনত্বের অনুপ্রবেশ ঘটেছে কিনা ?

- দেশের সরকার অনুমোদিত মূল স্রোতের শিক্ষা ধারা অঙ্গীভূত করা হয়েছে মকতবের এবং মাদ্রাসার শিক্ষার সঙ্গে । আধুনিক শিক্ষার উপকরণ

প্রযুক্তিবিদ্যাকেও স্থান দেওয়া হয়েছে । তবে প্রয়োজনের তুলনায় সবই অপ্রতুল নতুনত্বের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কায়।

- আর্থিক রোজগারের পন্থার অভাব , নিশ্চয়তার অভাব মকতব / মাদ্রাসা থেকে মুসলিম শিক্ষার্থীদের বিমুখ করিয়ে সরকারি স্কুলের অভিমুখে ঠেলে দিচ্ছে । স্বভাবত এই প্রতিষ্ঠানগুলির এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অবস্থানও সংকটজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে ।

৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার নির্বাহ হয় কি রূপে?

- কুরবানী ঈদের সময় পশুদের চামড়া থেকে একসময় ভালো আয় হতো । কিন্তু বর্তমানে আয়ের উৎস বন্ধ । চামড়া এখন জলে দেওয়া হয় বা 'গেরে' দেওয়া হয়।
- রোজা বা 'ক্ষেত্রা' মাসের শেষে জরিমানা থেকে অর্থ সংগৃহীত হয় । রোজা পালনের সময় কঠিন কৃচ্ছসাধনের পথে কোন অপরাধ ঘটলে পাপস্খালনের জন্য অর্থ প্রদান করা হয় ।
- ধর্মীয় অনুষ্ঠান জালসা থেকে আহৃত হয় অর্থ ।
- এককালীন কোন দান থেকেও আয় হয় ।

উপরিউক্ত আয় থেকেই মূলত ব্যয়ভার বাহিত হয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলির। সরকারি অনুদান

পাওয়া যায় কোন কোন সময় কিন্তু তার জন্য সরকার নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে পূরণ

করতে হয় ।

৬) পাঠদানকারী শিক্ষকের অবস্থান কিরূপ ?

পাঠদানকারী শিক্ষক অভিহিত হন মৌলবি বা আলেম নামে । বিশিষ্ট মৌলবিকে নির্বাচন করা হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শুক্রবার বা জুম্মাবারের খুদবা বা ভাষণের সভা থেকে । এই সভায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং বেতন সংক্রান্ত বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে মকতবের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। আবার , অনেক সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ আবেদন পত্র দেখে পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করা হয়ে থাকে ।

- শিক্ষকদের বেতন নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় । পূর্বে শিক্ষকদের জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে 'মুষ্ঠি' সংগ্রহ করা হতো। অর্থাৎ কোঠায় করে পাঁচশো গ্রাম করে চাল সংগ্রহ করতো সাকিদা (কালেক্টর)। যুগ পরিবর্তনের সাথে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে । বর্তমানে চালের পরিবর্তে অর্থ সংগ্রহ করা হয় । সংগৃহীত এই অর্থ থেকেই মকতবের শিক্ষকের বেতন , সাকিদের পারিশ্রমিক এবং মকতবের আনুষঙ্গিক ব্যায় নির্বাহ করা হয় ।

৬) শিক্ষার্থীদের অবস্থান কিরূপ ?

- শিক্ষার্থীর বয়সের কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই । শিশু কথা বলা শিখলেই সে ভর্তির উপযুক্ত হয়ে ওঠে । বয়সের ঊর্দ্ধসীমাও কিছু নেই। দরিদ্র ,প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের আবাসিক হিসেবে থাকার বন্দোবস্ত রয়েছে । শিক্ষা বেতনহীন ।

৭) পাঠ্যবিষয় কি কি ?

- প্রাথমিক ধর্মীয় আচরণ শিক্ষা , ফেকা (প্রাথমিক ইসলামী আইন), উর্দুর প্রাথমিক পাঠ , কোরান শরিফ পাঠ করতে শেখানো – এইগুলিই প্রাথমিক অবস্থায় পাঠ্য থাকে । এর পরবর্তী ধাপে কোরানের অর্থ সহ পাঠ শিক্ষণীয় বিষয় রূপে থাকে ।

৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কি কি প্রয়োজন ?

- শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন - অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জিত করে সিলেবাসের সংক্ষেপীকরন করলে ভালো হয় ।
- আধুনিক শিক্ষার প্রচলন আবশ্যক ।
- দুর্নীতি মুক্ত উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তির দরকার ।
- পুঁজিপতি ব্যক্তির সহৃদয় সহযোগিতা দরকার ।

আপনার মূল্যবান অভিমত জ্ঞাপনের জন্য ধন্যবাদ ।

টোল , চতুষ্পাঠীর বর্তমান রূপ

সাক্ষাৎকার ২

তথ্যদাতার পরিচয়ঃ দেবজ্যোতি মিশ্র

১) বর্তমানে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তার উদ্দেশ্য কি ?

প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবন ।

২) প্রাচীন ঐতিহ্যের শিক্ষা প্রকরণ , আদর্শের অনুসরণ বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে আছে কিনা ?

টোলে বর্তমানে প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণেই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ন্যায়, স্মৃতি, বৈষ্ণব দর্শন, ব্যাকরণ , কাব্য , মুগ্ধবোধ পড়ানো হয়।

কোন কোন জেলায় কোন কোন বিষয়ের প্রাধান্য থাকে । যেমন – নদীয়া জেলায় বৈষ্ণব শাস্ত্রের , মেদিনীপুরে মুগ্ধবোধের প্রাধান্য বেশী, হুগলীতে এবং কলকাতায় স্মৃতি।

নবদ্বীপে পঁয়ত্রিশটি টোল আছে বর্তমানে যেগুলির অবস্থা জরাজীর্ণ , সেখানে অধ্যাপক এবং ছাত্রের সংখ্যাও নগণ্য।

মাসিক একটা মহার্ঘ্য ভাতা (যৎসামান্য) পাওয়া যায় । প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতেই ট্রাস্টি বোর্ড এবং টোলের বর্তমান প্রতিনিধিরা নিজস্ব আয়ে নিরূপায়ভাবে একাজে অগ্রসর হয়েছেন ।

৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যায়ভার নির্বাহ হয় কিরূপে ?

পূর্বে একজন পণ্ডিতের নিকটে চার – পাঁচজন শিক্ষার্থী আবাসিক হিসেবে থেকে বিদ্যার্জন করতেন। পণ্ডিত মশায় যজন- যাজনিক কাজে যে উপার্জন করতেন সেখান থেকে টোলের ব্যায়ভার নির্বাহ হতো। এই যজন- যাজনিক কাজে আশ্রমিক শিক্ষার্থীরাও নিযুক্ত

থাকতেন। এই পদ্ধতির অনুসরণ বর্তমানেও রয়েছে । অনেক টোলের ব্যয়ভার আবার নিরূপায় হয়ে বহন করেন ট্রাস্টি বোর্ড । প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতেই ট্রাস্টি বোর্ড এবং টোলের বর্তমান প্রতিনিধিরা নিজস্ব আয়ে নিরূপায়ভাবে একাজে অগ্রসর হয়েছেন । সরকারের পক্ষ থেকে মাসিক যে মহার্ঘ্য ভাতা পাওয়া যায় তা যৎসামান্য এবং তাও নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছায় না।

শিক্ষার্থীর অবস্থাও শোচনীয়। সরকারের পক্ষ থেকে ২০০৮ এর পর থেকে পরীক্ষা নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে টোলের পণ্ডিতগণ পৌরহিত্য, যাজনিক ক্রিয়াকলাপ শিখিয়ে নিজেদের উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে পোরহিত্য কর্মে নিযুক্ত করিয়ে তাঁদের বৃত্তির প্রচেষ্টা করিয়ে দেন। এগুলি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য।

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছাড়াও অন্য বর্ণ এবং মুসলিম ছাত্রও আসে টোলে। কিছু সংখ্যক ছাত্রীও আসে। এই সকল ছাত্র আসে মূলত নিজেদের প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষা শিখতে।

মকতব মাদ্রাসার চিত্র

HOUSENAGAR HIGH MADRASAH - P.O. TINPAKURIA DIST. MURSHIDABAD
ESTD - 1970

টোল চতুষ্পাঠীর চিত্র

ভারতী চতুষ্পাঠী
*আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি
গরীয়সী*

শিক্ষা পদ্ধতির কালানুক্রমিক বিবরণ

১) বৈদিক পূর্ব যুগের শিক্ষা

৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ

শিক্ষা-ব্যবস্থার নিদর্শন সেভাবে পাওয়া যায় না , উন্নত নগর সভ্যতার গঠন এবং একটা লিপি থেকে অনুমান করা হয় উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি থাকার কথা ।

২) আদি বৈদিক যুগের শিক্ষা

১৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ -১০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ

গুরুকুল কেন্দ্রিক 'পরা' এবং 'অপরা' বিদ্যা । নারী এবং পুরুষ উভয়েরই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বর্ণ ভিত্তিক শিক্ষা থাকলেও তা নির্ধারিত হতো কর্ম অনুসারে , জন্ম ভিত্তিক নয়। গুরু-শিষ্য অচ্ছেদ্য বন্ধন। রাজকর্তব্য শিক্ষা ভার বহন করা।

সাহিত্যিক নিদর্শন – ঋগবেদ।

৩) পরবর্তী বৈদিক যুগের শিক্ষা

১০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ - ৬০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ।

নারী ,শূদ্র শিক্ষা নিষিদ্ধ।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ধরণই ছিল।

সাহিত্যিক নিদর্শন – সূত্রসাহিত্য , মহাকাব্য ।

৪) বৌদ্ধ শিক্ষা

৬০০ খ্রি পূর্বাব্দ থেকে শুরু

জাতিভেদ ছিল না। মাতৃভাষার প্রাধান্য।

সাহিত্যিক নিদর্শন – জাতক ।

৪) মধ্যযুগের বাংলার শিক্ষা

সময়কাল – ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ

হিন্দু শিক্ষা

দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা - টোল এবং উচ্চশিক্ষা – চতুষ্পাঠী। প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা ধারায় পঠন পাঠন । সাধারণের জন্য পাঠশালা এবং শিক্ষণীয় বিষয় দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বিষয়।

মুসলমান শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য – মকতব এবং উচ্চশিক্ষার জন্য – মাদ্রাসা।

সাহিত্যিক নিদর্শন – চৈতন্যজীবনী কাব্য সমূহ , মঙ্গলকাব্য সমূহ , অনূদিত কাব্যসমূহ , লৌকিক কাব্য ইত্যাদি ।

৫) উনিশ শতকীয় বাংলার ঔপনিবেশিক শিক্ষা

দেশীয় শিক্ষার স্থলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন। মিশনারি , দেশীয় , ব্রিটিশ উদ্যোগ।

দেশীয় পাঠশালার গুরুমশায়দের অবস্থার অবনতি।

সাহিত্যিক নিদর্শন – ‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা’, ‘সেকাল আর একাল’, ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ইত্যাদি

৬) <u>বিংশ শতকের বাংলার শিক্ষা- স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী</u>

পূর্ববর্তী – প্রাথমিক , মাধ্যমিক , উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় উদ্যোগ ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। কর্তৃপক্ষগণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল ক্ষমতাবান ধনী এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদী। শিক্ষকের পেশাগত নিশ্চয়তার অভাব , অনটন।

কথাসাহিত্যে প্রতিফলন - 'সন্দীপন পাঠশালা' , 'অনুবর্তন', 'কালনাগ', 'ভবিষ্যতের ভার' ইত্যাদি।

পরবর্তী – ইংরেজ প্রচলিত প্রাথমিক , মাধ্যমিক , উচ্চশিক্ষার ধারায় বহমান। সরকারী গাফিলতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শোচনীয় পরিণতি। প্রায় ৮০ –র দশক পর্যন্ত শিক্ষকের অর্থনৈতিক অনটন। নাম্বার ভিত্তিক পঠনপাঠন।

কথাসাহিত্যে প্রতিফলন- 'চতুষ্পাঠী', ' নির্জন শিখর', 'রাত্রির তপস্যা' , 'উত্তরসাধক' ইত্যাদি।

আকর গ্রন্থপঞ্জি

- চক্রবর্তী , স্বপ্নময় . *চতুষ্পাঠী.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ১৯৯৫.
- বন্দ্যোপাধ্যায় , তারাশঙ্কর . *তারাশঙ্কর রচনাবলী(ঊনবিংশ খণ্ড).* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ভাদ্র ১৩৬৩.
- বন্দ্যোপাধ্যায় , তারাশঙ্কর. *তারাশঙ্কর রচনাবলী(সপ্তম খণ্ড).* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৫৯.
- বন্দ্যোপাধ্যায় , তারাশঙ্কর. *সন্দীপন পাঠশালা.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা , আষাঢ় ১৩৬৯.
- বসু, বুদ্ধদেব. *শোন পাংশু* . কলকাতা: এম পি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৬.
- বসু, বানী . *উত্তর সাধক* . কলকাতা: আনন্দ পাবলিশারস , ২০১২ .
- বসু, মনোজ . *মানুষ গড়ার কারিগর* . কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, মার্চ ১৯৬০ .
- মিত্র, প্যারীচাঁদ. *আলালের ঘরের দুলাল (বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত).* সংখ্যা তৃতীয় সংস্করণ. কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৌষ ১৩৬২.
- মিত্র , গজেন্দ্র কুমার. *রাত্রির তপস্যা.* কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৩৫৫.
- সিংহ, কালীপ্রসন্ন. *হুতোম প্যাঁচার নক্সা.* ১৮৬২ খৃ মুদ্রিত সংস্করণ হইতে পুনমুদ্রতি.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- আচার্য , অনিল সম্পাদিত. *সত্তর দশক (৩য় খণ্ড).* কলকাতা: অনুষ্টুপ, ৩য় সংস্করণ.
- আচার্য, পরমেশ . *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, পৃ* ২ . অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯.
- আচার্য, পরমেশ. *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ মে ২০১১.
- আব্দুল আজিজ আল আমন সম্পাদিত, রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে. *ঋগ্বেদ সংহিতা, ২য় খণ্ড , পৃ-১৬৯.* হরফ প্রকাশনী, কোন তারিক নেই.
- *ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর.* বর্ণ মিছিল প্রকাশন, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮.
- গুপ্ত, অতুলচন্দ্র. *শিক্ষা ও সভ্যতা.* কলকাতা: ক্যালকাটা পাবলিশারস, ১৩৩৪.
- গুপ্ত, অতুলচন্দ্র. *শিক্ষা ও সভ্যতা.* কলিকাতা: ক্যালকাটা পাবলিশার্স, তারিখ নেই.
- গুপ্ত , ডক্টর সুশীল কুমার. *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ.* কলিকাতা: এ মুখারজী অ্যান্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৬ সাল.
- গুপ্ত, প্রতিভা. *সমাজ ও শিশুশিক্ষা.* কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৪৫.
- গুপ্ত, সুশীল কুমার. *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ (১৮০১-১৮৬০).* এম মুখারজী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কোন তারিক নেই.
- গুপ্ত, ক্ষেত্র. *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস.* তারিখ নেই.
- গোস্বামী , অর্জুন সম্পাদিত. *নকশালবাড়ির দিনগুলি.* গাঙচিল, ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৭.
- ঘোষ, ঈশানচন্দ্র অনূদিত. *জাতক (১ম খণ্ড).* কলিকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২য় মূদ্রণ আষাঢ় ১৩৮৭.
- ঘোষ, বিনয়. *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ.* দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ১ম সংস্করণ ১৪১৭.
- ঘোষ, বিনয়. *বিদ্রোহী ডিরোজিও , ৫ম সংস্করণ.* কলকাতা: প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ২০১০.

- ঘোষাল, সুধীর চন্দ্র ও মুখোপাধ্যায়, বৈশম্পায়ন. *প্রাথমিক শিক্ষক দর্পণ.* কলিকাতা : রামায়ণী প্রকাশ ভবন, তারিখ নেই.
- চক্রবর্তী , জনার্দন. *স্মৃতিভারে.* কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম মূদ্রণ , দোল পূর্ণিমা ১৩৬১ .
- চক্রবর্তী , সুধীরকুমার. *বৈদিক উপনিষদ.* কলিকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, ১ম প্রকাশ ১৩৬৪.
- চক্রবর্তী, শ্যামল সম্পাদিত. *সোনার মলাট তারাশঙ্কর.* রামায়নী প্রকাশ ভবন, ১৯ শে জুলাই ১৯৬০.
- চক্রবর্তী, সুমিতা. *বিভূতিভূষণের অপুঃ একটি জিজ্ঞাসা(পৃষ্ঠা ১২) বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা.* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,নবম সংকলন, প্রকাশকাল ৩০ ডিসেম্বর ,১৯৯৫ .
- চট্টোপাধ্যায়, অনিলচন্দ্র. *মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙ্গালি.* কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, জুলাই ১৯৫৯.
- চট্টোপাধ্যায়, শ্রী বসন্তকুমার সম্পাদিত. *উপনিষদ (প্রথম খণ্ড).* কলিকাতা, ১৩৫৩.
- চট্টোপাধ্যায় , শ্রীহরিসাধন. *আমরা বাঙ্গালী.* কলিকাতা: এইচ, চ্যাটারজ্জী এন্ড কোং লিঃ, ১৯৫২.
- টিপু, আবু নাছের. *শিক্ষা সংস্কারের দুইশ বছর.* অনিন্দ্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৭(পৃষ্ঠা ৩০).
- ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ. *শিক্ষা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ভাদ্র ১৪১৭ .
- *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ.* রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি, তারিখ নেই.
- ধর , কমলেন্দু . *স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ.* দেশকাল, ১ম প্রকাশ ১৯৫৯ .
- নাথ, নিরুপমা. *‘অনুবর্তন’- শিক্ষক জীবনের অপূর্ব আলেখ্য , ভট্টাচার্য , তপোধীর সম্পাদিত.* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা,২০১৭.
- নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি সম্পাদিত. *আচার্য কাহিনী.* ১ম প্রকাশ বৈশাখ ,১৪১১.

- পত্রী , পূর্ণেন্দু . *পুরনো কলকাতার পড়াশোনা* . কোন তারিক নেই.
- পশ্চিমবঙ্গ (স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি বিশেষ সংখ্যা). কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, এপ্রিল ১৯৯৯ .
- বঙ্গদেশে বর্তমান শিক্ষাবিস্তার. তারিখ নেই.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চন্দ্র. *মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী.* কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা: ১৯৫৯ .
- বন্দোপাধ্যায়, অসিত. *সাহিত্যের ইতিহাস.* তারিখ নেই.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর. *আমার কালের কথা.* বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮.
- বন্দ্যোপাধ্যায় , ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত. *সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩০),২য় সংস্করণ.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, আষাঢ় ১৩৪৪.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত. *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় ভাগ).* কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৪.
- বসু , রাজনারায়ণ. *আত্ম-চরিত.* কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৯.
- বসু , রাজনারায়ণ. *আত্মচরিত.* কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেস, ১৩১৫.
- বসু , স্বপন ও দত্ত, হর্ষ সম্পাদিত. *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি.* পুস্তক বিপণি, ২০০০.
- বসু, ড. নিতাই. *তারাশঙ্করের শিল্পীমানস.* দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩.
- বসু, শ্রী রাজনারায়ন. *সেকাল আর একাল.* বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত, শকাব্দ ১৭৯৬.
- বড়ুয়া, শ্রীধরচন্দ্র. *প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ.* কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটী, কোন তারিক নেই.

- বাগচি , জ্যোতিপ্রকাশ. *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা.* কলিকাতা : স্টুডেন্ট লাইব্রেরী , ১৯৫৯.
- বাগল, যোগেশচন্দ্র. *জাগৃতি ও জাতীয়তা.* মিত্র ও ঘোষ (পৃষ্ঠা ১৩৬), কোন তারিক নেই.
- ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন সম্পাদিত. *বিশ্বভারতী পত্রিকা (নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯৪২-২০০৩ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ).* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১২.
- ভট্টাচার্য, শ্রী দেবীপদ . *আমার জীবনী.* তারিখ নেই.
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী. *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১ম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৬০.
- ভট্টাচার্য, সুখময় . *মহাভারতের সমাজ.* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১ম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৩.
- ভাদুড়ী, পিনাকী. *রবীন্দ্রসাহিত্যে শিক্ষাপ্রসঙ্গ, ১৬১.* কোরক পত্রিকা, তারিখ নেই.
- *ভারতীয় শিক্ষা- সমস্যার গতিপ্রকৃতি (১ম খণ্ড).* তারিখ নেই.
- *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা.* ১ম প্রকাশ জুলাই ১৯৫৯.
- মজুমদার , রমেশচন্দ্র. *বাংলাদেশের ইতিহাস(২ য় খণ্ড).* কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৩.
- *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি.* তারিখ নেই.
- চক্রবর্তী , মনোতোষ. *হিন্দু কলেজ ও উনিশ শতকের বাংলার সমাজ .* কলিকাতা: সুবর্ণরেখা, ১ম প্রকাশ ১৯৭৯.
- মিত্র, হরপ্রসাদ . *তারাশঙ্কর.* আইডিয়াল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৬৮.
- মুখোপাধ্যায় , অরুণকুমার . *কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর : ১৮৯১-২০১০).* দে'জ পাবলিশিং , চতুর্থ সংস্করণ , সেপ্টেম্বর ২০১১.

- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত. *মনু-সংহিতা, ৩য় সংস্করণ.* কলিকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ.
- রায় , অনিরুদ্ধ. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত. *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি.* কলিকাতা: কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানি , ১৯৯২ .
- রায় , আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র. *আত্মচরিত.* কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, তারিখ নেই.
- রায় , কালিপদ. *শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ.* কলিকাতা: টেগোর রিসারচ ইন্সটিটিউট ১৩৬৫.
- রায়, সত্যেন্দ্রনাথ . *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ.* কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় প্রকাশ ১৪০৮.
- শ্রী শ্রীবিষ্ণুশর্মা. তারাকুমার কবিরত্ন অনুদিত. *হিতোপদেশঃ.*, জে এন ব্যানারজি এন্ড সন্স, কলকাতা: ১২৪৫.
- সমাদ্দার, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সঙ্কলিত. *অর্থশাস্ত্র (চাণক্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্রের' বঙ্গানুবাদ).* হাওড়া: কর্মযোগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩২৯.
- সরকার, শ্রী গোপালচন্দ্র. *বঙ্গদেশে বর্তমান শিক্ষাবিস্তার.* স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, কলিকাতা ,১৩৩৩.
- সেনগুপ্ত, শিতিকণ্ঠ. *শিক্ষা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক.* ন্যাশনাল পাবলিশার্স , কলকাতা: বৈশাখ ১৩৬৯.
- সরকার, বিনয় . *নয়া বাংলার গোড়াপত্তন (২য় ভাগ)* . চক্রবর্তী , চ্যাটার্জী এন্ড কোং, ১৯৩২ .
- সেন, সুকোমল. *ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ.* কলকাতা: ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, তারিখ নেই.
- সেন, ত্রিপুরাশঙ্কর. *ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য.* কলিকাতা: পপুলার লাইব্রেরী, ২য় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৫.

* হালদার, গোপাল. *বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা (দ্বিতীয় খণ্ড).* কলিকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬১.
* হালদার, গোপাল সম্পাদিত. *সোনার বাংলা (৩য় খণ্ড , অতীত ইতিহাস).* বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৩.
* Mookerjee, Radha Kumud. *Ancient Indian Education.* Delhi: Motilal Banarsi Dass Publishers Private Limited, First Edition:London, 1947.

অন্তর্জাল তথ্যসুত্র

* https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/desires-of-a-modern-indian/the-importance-of-the-gurukul-system-and-why-indian-education-needs-it/
* https://schoolofyoga.in/thought-leadership/guru-gurukul
* http://www.vkmaheshwari.com/WP/?p=1772
* http://archive.mu.ac.in/myweb_test/ma%20edu/History%20of%20Edu..pdf

সহায়ক পত্রিকাসমুহ

- ভৌমিক, তাপস সম্পাদিত . *কোরক শিক্ষক-শিক্ষণ-শিক্ষকতা সংখ্যা* , প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪১৯
- পুরকাইত, উত্তম সম্পাদিত . *উজাগর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা)* , দ্বাদশ বর্ষ , প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা , ১৪২১
- পুরকাইত, উত্তম সম্পাদিত . *উজাগর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা(নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা)* , দশম বর্ষ , প্রথম সংখ্যা , ১৪১৯